Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাজেদা খাতুন

রোলঃ 227020194

২০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাজেদা খাতুন

রোলঃ 227020194

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাজেদা খাতুন, আইডিঃ 227020194 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মাজেদা খাতুন

আইডিঃ 227020194

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা: 7

সালাতের সংজ্ঞা 11

কোরআনে সালাতের বিভিন্ন অর্থ: 11

সালাত কখন ফরয হয়? 15

পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি সালাতের নির্দেশ: 15

শরী'আতে সালাত বিধিবদ্ধ হওয়ার হিকমত: 19

সালাতের আদেশ: 20

বাচ্চাদের সালাতের নির্দেশ: 24

সালাত কায়েমের উদ্দেশ্য: 25

আকিমুস সালাত' বা 'নামাজ কায়েম করা' বলতে কী বুঝায়? 25

(ক) নামাজকে ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা : 25

(খ) নামাজের শিক্ষাকে ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা : 26

নামাজকে সমাজে প্রতিষ্ঠা: 29

ক- ফরজ নামাজ জামায়াতের সাথে পড়ে নামাজকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা : 29

কুরআন ও হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত 33

হাদীসের আলোকে সালাত 34

ইসলামে সালাতের বিধান কি? কার উপর সালাত ফরয? 36

নিম্নলিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ছালাত ফরযঃ 37

সালাত আদায়কারী মুমিনদের বৈশিষ্ট্য: 38

হাদীসের আলোকে সেরা সালাত: 42

সালাত অস্বীকারকারীর হুকুম: 51

জীবনে সালাত কায়েমের ফজিলত ও গুরুত্ব: 52

কুরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত: 54

নামাজের ফজীলত সম্পর্কে চল্লিশটি হাদিস: 63
হাদিসের আলোকে সালাতের ফজিলত: 68
মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ দোয়া `নামাজ’: 75
সালাত গোনাহ মার্জনার অন্যতম উপায় 77
জামা'আতে সালাত আদায় করার গুরুত্ব: 85
নামাজের উপকারিতা: 87
নামাজের জাগতিক উপকারিতা: 91
সালাতের পূর্ব প্রস্তুতি- পবিত্রতা অর্জন 93
গোসলের মাধ্যমে পাক-পবিত্রতা : 95
তায়াম্মুম কী? 96
প্রতি ওয়াক্ত সালাত কায়েমে আজানের ভূমিকা 98
৪. সালাতের সময়সমূহ: 102
আজান ও ইকামাত সম্পর্কিত কিছু মাসআলাহ 105
সালাত ফার্‌য হওয়ার জন্য শর্তাবলীঃ 107
সালাতের মাকরুহ সময়: 115
সালাত আদায়ের নিয়ম: 117
চিত্রসহ সালাত আদায় (কায়েমের) করার নিয়ম নিয়ে: 123
পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের বিবরণ 140
ফজরের নামাজ পড়লে ১০ পুরস্কার পাওয়া যায়: 144
"যোহরের নামাযের" নির্দেশ 147
আসর নামাযের ফযীলত: 149
"মাগরিবের নামাযের" নির্দেশ- 150
"এশার নামাযের" নির্দেশ: 152
প্রতিদিন আমল করা যায় এমন গুরুত্বপূর্ণ নফল নামায সমূহের গুরুত্ব ও ফযীলত: 156

পাপ মুক্তিতে তাহাজ্জুদ নামাজ:.. 161
সালাত আল-ইস্তিখারা:... 171
নামাযের শর্ত:... 178
নির্ধারিত সময়ে নামায আদায়ের গুরুত্ব:.. 184
মোয়াজ্জিনের আযান শুনেও জামায়াতে হাজির না হওয়ার পরিণাম:............................... 189
নিজের খেয়াল খুশিমতো নামায আদায়কারী ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত:.............................. 191
নারীদের ওপর ফরয বা যেকোন নামাযই জামা'আতে আদায় করা ওয়াজিব নয়: 193
নামাযে একাগ্রতার গুরুত্ব:... 195
খুশূ বা একাগ্রতার পরিচয়: 196
নামাযে খুশূ হাসিলের সহায়ক তিনটি বিষয়:... 207
একাগ্রচিত্ত নামাযের বাস্তব উদাহরণ: 213
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায:.. 213
সাহাবায়ে কেরামের নামায:.. 214
সালাফে সালেহীনের নামায:.. 217
নামাজ না পড়ার পরিনতি: 218
সালাত পরিত্যাগকারীর ইহকালীন বিধান:.. 221
নেফাকিপূর্ন নামাযের ব্যাপারে সতর্কতাঃ 221
শেষকথা...223

প্রারম্ভিকা:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত হচ্ছে দ্বিতীয়। পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় সালাতের স্থলে নামাজ কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আভিধানিক ভাবে দোয়া, দুরুদ, প্রতিদান, কারো দিকে মুখ করা, নিকটবর্তী হওয়া, অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'সালাত' কুরআন, হাদীস, ইজমা দ্বারা প্রমাণিত ফরজ। রাসুল (সা:) এর আমল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সব মুসলিম কোনো মতবিরোধ ছাড়াই এর ফরজিয়াত, গুরুত্ব, তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ স্বীকার করে আসছেন।

রাসুল (সা:) এর মক্কি জীবনে মিরাজের সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়। ঈমানের পরই এর স্থান। একজন লোকের ঈমানের প্রমাণ ও বাস্তব রূপ প্রকাশ পায় তার নামাজ আদায়ের মাধ্যমে। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ পালন করা হয় এবং সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ এনে দেয়। রাসুল (সা:) বলেছেন- বান্দা সিজদারত অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।[1] পৃথিবীতে প্রত্যেক নবী-রাসুলের ওপরই সালাত ফরজ ছিল।

হযরত আদম (আঃ) ও তার বংশধর হযরত নুহ (আঃ) ও হজরত ইব্রাহীম (আঃ) কে নামাজের আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা নামাজ পড়ত; এর প্রমাণ মিলে আয়াতে। মহান আল্লাহ বলেন, নবীদের মধ্যে যাদের আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন এরাই তারা, আদমের ও যাদের তিনি নূহের সথে নৌকায় আরোহন করিয়েছিলেন তাদের বংশোদ্ভুত, ইব্রাহীম ও ইসরাইলের বংশোদ্ভুত এবং যাদের তিনি পথনির্দেশ করেছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিকট করুনাময় আল্লাহর আয়াত আবৃত্তি হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও রোদন করত।[2] মহান আল্লাহ বলেন, 'হে আমার রব, আমাকে এবং আমার

---

[1] মুসলিম

[2] সূরা মরিয়মের, আয়াত- ৫৮

বংশধরকে যথাযত নামাজ প্রতিষ্টাকারী কর।[3] মহান আল্লাহ বলেন, হে বৎস! নামাজ কায়েম করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে, অসৎ কাজ প্রতিরোধ করবে এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে।[4]

অনুরূপ ভাবে কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবী রাসুলের ব্যাপারেই স্পষ্ট আয়াত রয়েছে, যাদেরকে সালাতের তাকিদ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কালামে পাকে নামাজের আদেশ, গুরুত্ব,তাৎপর্য ও সফলতা সংক্রান্ত যে আয়াতগুলো রয়েছে, এগুলোর মধ্যে কিছু আয়াত সুরার নাম সহ উল্লেখ করা হলো: বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা:) কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়।- 'আমার বান্দাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের নামাজ কায়েম করতে বলুন'।[5] মহান আল্লাহ বলেন- ওহে যারা ঈমান এনেছে তোমরা রুকু করো, সিজদা করো ও তোমাদের রবের ইবাদত করো এবং সৎ কাজ করো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।[6] মহান আল্লাহ বলেন, আর আপনার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দিন এবং আপনি নিজেও এতে অবিচলিত থাকুন।[7] মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত প্রদান এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।[8] মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা নামাজ সমূহকে হেফাজত করো। বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজকে আর আল্লাহর সামনে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াও।[9]

এ আয়াতের মধ্যবর্তী সালাত বলতে আসরের নামাজের কথা বলা হয়েছে। কারণ এই সময়ে মানুষের মধ্যে ব্যস্ততা বেশি থাকার দরুন নামাজটি ফউত(কাজা) হওয়ার

[3] সূরা ইব্রাহীমের, আয়াত- ৪০

[4] সূরা লোকমানের, আয়াত- ১৭

[5] সূরা ইব্রাহীম, আয়াত- ৩১

[6] সূরা আল হজের আয়াত- ৭৭

[7] সুরা ত্বহার আয়াত- ১৩২

[8] সুরা বাকারার আয়াত- ৪৩

[9] সুরা বাকারার আয়াত- ২৩৮

সম্ভাবনা বেশি থাকে। সে জন্য এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আসরের নামাজ ছেড়ে দিল, সে যেন তার পরিবার ও ধনসম্পদ হারাল।[10] বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে আসরের নামাজ ছেড়ে দিয়ে পরে তা আদায় করলে আদায় হবে না।[11]

নামাজের সফলতার বাণীও প্রচারিত হয়েছে আল কুরআনের অনেক জায়গায়। 'ঈমানদাররা অব্যশই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়ী ও নম্র।[12] সফলকাম ব্যক্তি সেই যে পবিত্রতা অর্জন করেছে। আপন প্রতিপালকের নাম স্বরণ করেছে এবং নামাজ আদায় করেছে।[13] নামাজ না পড়ার জন্য যে শাস্তির কথা আল কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'কী অপরাধে তোমাদের দোজখে টেনে আনা হলো? তারা উত্তরে বলবে, আমরা মুসলিমদের অর্ন্তভূক্ত ছিলাম না তথা সালাত আদায় করিতাম না।[14]

যারা নামাজ আদায় করে না, হাদিস শরিফে তাদের সর্ম্পেক অনেক সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন- রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, বান্দা ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ আদায় না করা।[15] মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই নামাজ খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।[16] নামাজ মানুষকে চিন্তামুক্ত রাখে তাই রাসুল (সল্লাল্লাহু

---

[10] বুখারি শরিফের হাদিস- ১/৫৫২

[11] বুখারি শরিফের হাদিস- ১/৫৫৩

[12] Al-Quran- ২৩:১-২

[13] সুরা: আল আলাক, আয়াত ১৪-১৫

[14] সূরা আল মুদাসসির, আয়াত ৪২:৪৩

[15] মুসলিম

[16] সুরা আল আনকাবুত, আয়াত- ৪৫

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো ব্যাপারে পেরেশান হলে নামাজ আদায় করতেন। বলা হয়েছে, 'তোমরা নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।'[17]

এ ছাড়াও কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন স্থানে নামাজ আদায় করার আদেশ, এর সুফল ও আদায় না করার কুফল সম্পর্কে অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো নামাজের স্বরূপ নিয়ে। নামাজের স্বরূপ হলো দু'টি-ফরজিয়াত: ফরজিয়াত সালাতগুলো হচ্ছে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ১৭ রাকাত ফরজ নামাজ এবং এর সাথে আনুষাঙ্গিক কিছু সুন্নত ও নফল নামাজও রয়েছে। এই ফরজ নামাজগুলো ১০ বছর বয়স থেকে শরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত (যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে) ফকির, বাদশা, আমির ওমরাহ সুস্থ-অসুস্থ, শাসক-শাসিত, মনিব-গোলাম, মুকিম-মুছাফির সবার জন্য ফরজ।

জাকাত, রোজা ও হজের ফরজিয়াতের বেলায় পূর্বশর্ত ও অবস্থার সাথে দেয়া হয়েছে। কিন্তু নামাজ এমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবাদত, যা সব সময় সব অবস্থায় ফরজ। এই ফরজিয়াত নামাজ পরিত্যাগ করলে, কায়েম না করলে বান্দাকে শাস্তি পেতে হবে। ফরজ নামাজের বিনিময়ে কোনো সওয়াব বা প্রতিদানের প্রত্যাশা করা যাবে না। ফরজ নামাজ আদায়ের পর ব্যক্তির জন্য আরো ফরজ কাজ রয়েছে, যেমন- হালাল রিজিক অর্জন, সদাচরণ, নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন ইত্যাদি।

[17] সূরা বাকারার, আয়াতে- ১৫৩

সালাতের সংজ্ঞা

সালাতের পারিভাষিক অর্থ- ‘ছালাত’ -এর আভিধানিক অর্থ দো‘আ, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি।[18] পারিভাষিক অর্থ: ‘শরী‘আত নির্দেশিত ক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদতকে ‘ছালাত’ বলা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালাম দ্বারা শেষ হয়’।[19]

'কিছু পাঠ ও কিছু কাজ এর সমন্বয়ে বিশেষ একটি ইবাদত; যা রুকু-সিজদা সহকারে নির্ধারিত শর্তাবলি সহিত আদায় করা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করত; সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। তাকে সালাত বলা হয়।'

কালেমায়ে শাহাদাতের পর ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় রুকন সালাত। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

সালাত ফরয হওয়া কুরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলমানদের ইজমা (বা ঐকমত্য)

দ্বারা প্রমাণিত; এ জন্য কোন মুসলিম যদি পাঁচ ওয়াক্ত বা কোন এক ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের (মুরতাদ) ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হিসাবে বিবেচিত।

কোরআনে সালাতের বিভিন্ন অর্থ:

পবিত্র কোরআনে সালাতের ১২ অর্থ ----------

সালাত বা নামাজ এমন ইবাদত, যা সব আসমানি ধর্মে পাওয়া যায়। যদিও তা আদায়ের পদ্ধতি পরস্পর থেকে ভিন্ন। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, ‘আল্লাহ কোনো যুগকে শরিয়তমুক্ত রাখেননি এবং কোনো শরিয়তকে নামাজমুক্ত রাখেননি।’ পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে নামাজের বর্ণনা এসেছে।

---

[18] الصلاة أي الدعاء والرحمة والإستغفار، صلي صلاة أي دعا، عبادة فيها ركوع وسجود = প আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, ১৬৮১ ঃ

[19] مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ= আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩১২ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯১ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ-১০।

কোরআনে নামাজকে ‘সালাত’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে সালাত শব্দটি শুধু নামাজ অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি। সালাত আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

সালাতের সাধারণ অর্থ : আরবি সালাত শব্দের সাধারণ অর্থ দুটি। **ক.** আগুন বা সদৃশ উত্তপ্ত জিনিস। যেমন—বলা হয়, ‘সাল্লাইতুল উদা বিন-নারি’ (আমি আগুন দ্বারা উদ প্রজ্বালিত করেছি), **খ.** দোয়া বা প্রার্থনা। ধর্মতাত্ত্বিকরা বলেন, নামাজকে সালাত বলা হয় কেননা তাতে দোয়া ও প্রার্থনা আছে।

কোরআনে সালাত : পবিত্র কোরআনে সালাত শব্দটি ১০০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৮৫ বার বিশেষ্য পদ হিসেবে। যেমন—‘যারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ কায়েম করে।’

আর ১৫ বার ক্রিয়াপদ হিসেবে। যেমন—‘সে দান করেনি এবং নামাজ আদায় করেনি।’[20] কোরআনে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: পবিত্র কোরআনে ‘সালাত’ শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

১. ফরজ নামাজ : পবিত্র কোরআনে ‘সালাত’ শব্দটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফরজ নামাজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশেষত যখন তা জাকাতের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা নামাজ কায়েম করো।’[21]

২. অনুগ্রহ : আল্লাহ বলেন, ‘তাদের প্রতি আছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহ।’[22]

---

[20] সুরা : কিয়ামা, আয়াত : ৩১

[21] সুরা : বাকারা, আয়াত : ৪৩

[22] সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৫৭

৩. অনুগ্রহ প্রার্থনা : পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য।'[23]

৪. ক্ষমা প্রার্থনা : আল্লাহ বলেন, 'আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা তাদের জন্য প্রশান্তি লাভের উপায়।'[24]

৫. কোরআন তিলাওয়াত : আল্লাহ বলেন, 'নামাজে তোমার তিলাওয়াতকে উচ্চৈঃস্বরে কোরো না এবং অতিশয় ক্ষীণ কোরো না; দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কোরো।'[25]

৬. ভয়ের নামাজ : যুদ্ধের ময়দানে ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে এবং সৈনিকদের জীবনে ঝুঁকি তৈরি হলে বিশেষ পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করতে হয়। শরিয়তের পরিভাষায় তাকে 'সালাতুল খাউফ' বা ভয়ের নামাজ বলা হয়। কোরআনে 'সালাত' শব্দ দ্বারা বিশেষ এই নামাজকেও বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে এবং তাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করবে, তখন তাদের একদল তোমার সঙ্গে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে।'[26]

৭. জানাজার নামাজ : সালাত দ্বারা জানাজার নামাজও উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেন, 'তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাজার নামাজ পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না; তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।'[27]

৮. জুমার নামাজ : পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! জুমার দিন যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও।'[28]

---

[23] সুরা : আহজাব, আয়াত : ৪৩

[24] সুরা : তাওবা, আয়াত : ১০৩

[25] সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১১০

[26] সুরা : নিসা, আয়াত : ১১০

[27] সুরা : তাওবা, আয়াত : ৮৪

[28] সুরা : জুমা, আয়াত : ৯

৯. নামাজের জামাত : পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা যখন নামাজের (জামাতে সমবেত হওয়ার) জন্য আহ্বান করো, তখন তারা তাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে।’[29]

১০. ইবাদতের স্থান : সালাত শব্দটি কোরআনে ইবাদতের স্থান অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, সালাওয়াত তথা ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদগুলো, যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম।’[30]

১১. দরুদ : কোরআনে সালাত শব্দটি নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরুদ পাঠের অর্থেও এসেছে। আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনরা! তোমরা নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।’[31]

১২. দ্বিনদারি : পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তারা বলল, হে শোয়াইব! তোমার নামাজ কি তোমাকে এই নির্দেশ দেয় যে আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদত করত আমাদের তা বর্জন করতে হবে অথবা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও? তুমি অবশ্যই সহিষ্ণু, ভালো মানুষ।’[32]

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, এই আয়াতে নামাজ দ্বারা ঈমান ও দ্বিনদারি উদ্দেশ্য।

সালাত কাকে বলে?

ইসলামী পরিভাষায়- শারিয়াহ নির্ধারিত তথা মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আমলকৃত

[29] সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৫৮

[30] সুরা : হজ, আয়াত : ৪০

[31] সুরা : আহজাব, আয়াত : ৫৬

[32] সুরা : হুদ, আয়াত : ৮৭

কতিপয় আরকান-আহকাম সহকারে বিশেষ বিশেষ ওয়াক্ত বা সময়কালে আদায়কৃত বিশেষ ইবাদাতকে সালাত বা নামায বলে।

অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট শর্তাবলীতে নির্দিষ্ট কিছু কথা ও কাজ, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম ফিরানোর দ্বারা শেষ হয়।

সালাত কখন ফরয হয়?

হিজরতের পূর্বে ইসরা তথা মি'রাজের রাতে সালাত ফরয হয়। ইসলামে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাক্ষ্য প্রদানের পরের রুকন হলো সালাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের পরে সালাতের শর্ত দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ في سبيل الله

"সব কিছুর মাথা হলো ইসলাম, বুনিয়াদ হলো সালাত আর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ"।[33]

পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি সালাতের নির্দেশ:

কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর মত পূর্ববর্তী নবীগণকেও দিয়েছেন। কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, নামাযও ওসব বিষয়ের অন্যতম, যার বিধান আল্লাহ অন্যান্য নবীদেরকেও দান করেছেন (যদিও নামাযের সংখ্যা ও বিস্তারিত পদ্ধতি এক রকম ছিল না)। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ., ইসহাক আ., ইয়াকুব আ. এর আলোচনা করে বলেন-

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ

33 [ص: 495] هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, যারা আমার নির্দেশে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত। আমি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে। আর তারা আমারই ইবাদতকারী ছিল।[34]

মারইয়াম আলাইহাস সালাম যখন সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে নিজ স¤প্রদায়ের কাছে এলেন তখন তারা তাঁর প্রতি অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করতে লাগল। তিনি ইশারায় তাদের জানালেন তারা যেন শিশুটিকেই জিজ্ঞাসা করে, কীভাবে তার জন্ম হয়েছে। তখন তারা বলল, আমরা দোলনার শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলব? এমন সময় আল্লাহ শিশুটির যবান খুলে দিলেন। দোলনার শিশু ঈসা মাসীহ বলতে শুরু করলেন-

اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا

আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় আমি যেখানেই থাকি এবং আমাকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি। এবং আমাকে করেছেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগা। আর আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব।[35]

এখান থেকে এটা যেমন জানা গেল যে, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল, তেমনি এও বোঝা গেল যে, নামায অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তো দোলনার শিশুর যবান দিয়ে আল্লাহ যে কটি কথা বলিয়েছেন তাতে নামায স্থান

[34] সূরা আম্বিয়া (২১) : ৭৩

[35] সূরা মারইয়াম (১৯) : ৩০-৩৩

পেয়েছে। ঈসা মাসীহের এ বাণী থেকে আরো জানা গেল, যতদিন হায়াত থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামায পড়তে হবে।

মূসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ান থেকে সপরিবারে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে আগুন দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এলেন। আসলে এটা জাগতিক আগুন ছিল না। এটা ছিল আল্লাহর নূর। কাছে আসার পর আল্লাহ তাঁকে ডেকে বললেন-

اِنِّیٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى اِنَّنِیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِی.

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক। সুতরাং তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা তুমি পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায় রয়েছ। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যা বলা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোন। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর।[36]

আয়াতের শৈলী থেকে বোঝা যায়, এখানেই মূসা আলাইহিস সালামকে নবুওত দান করা হয়। তো নবুওতের সূচনাতেই তাঁকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও নামায কায়েমের আদেশ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোত্তম ইবাদত। আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। হাঁ, নামায আগাগোড়া আল্লাহর যিকির১ এবং এতে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। এটা নামাযের অনন্য বৈশিষ্ট্য। নামায ছাড়া অন্য কোনো বিধান এমন নেই, যা আদ্যোপান্ত আল্লাহর যিকির এবং যেখানে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। শুধু তাই নয়; নামাযে রয়েছে বিভিন্ন অবস্থার যিকির- দাঁড়িয়ে যিকির, বসে যিকির, মাথা ঝুঁকিয়ে যিকির, মাটিতে লুটিয়ে যিকির। আল্লাহর বড়ত্বের যিকির, গৌরবের যিকির, পবিত্রতার যিকির, হামদ ও ছানার যিকির, প্রার্থনা ও নিবেদনের যিকির।

[36] সূরা ত্বহা (২০) : ১২-১৪

আমাদের উচিত যিকিরপূর্ণ এ ইবাদতটি মহব্বত ও মনোযোগের সাথে আদায় করা; অলসতা ও উদাসীনতার সাথে নয়। যিকিরের সঙ্গে কি উদাসীনতা মানায়? আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর-বাড়ি কর এবং তোমাদের ঘরসমূহকে নামাযের স্থান বানাও এবং নামায কায়েম কর আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও।[37]

এখান থেকে জানা গেল, মূসা আ. ও হারূন আ.-সহ তাঁদের গোটা সম্প্রদায়ের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল। আয়াতটি আরো নির্দেশ করে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নামায আদায় করতে হবে। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। প্রতিকূলতা দূর হবে।

কতিপয় তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে মূসা আ. ও হারূন আ.-কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এটা তখনকার কথা যখন বনী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল এবং ইবাদতখানায় নামায আদায়ে তাদের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তখন তাদেরকে নামায তরক না করে ঘরেই আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী নবীদের উপর যখন নামাযের বিধান ছিল তো তাঁদের উম্মতেরা অবশ্যই এর আওতাভুক্ত ছিল। বিশেষত সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে নামাযের

[37] সূরা ইউনুস (১০) : ৮৭

বিধান দেওয়ার বিষয়টি কুরআন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ اَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ.

নিশ্চয় আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে আমি বারজন নেতা নির্ধারিত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করব এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আর এর পরও তোমাদের মধ্যে যে কুফর অবলম্বন করবে, নিশ্চয় সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।[38]

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, বনী ইসরাঈলের উপর নামাযের বিধান ছিল। সেইসঙ্গে এটাও জানা গেল যে, নামাযসহ উপরিউক্ত আমলগুলো করলে আল্লাহর সঙ্গ লাভ হবে। গোনাহ মাফ করা হবে এবং জান্নাত দান করা হবে।

শরী‘আতে সালাত বিধিবদ্ধ হওয়ার হিকমত:

আল্লাহ তাঁর বান্দাহর ওপর যেসব নি‘আমত দান করেছেন সালাত হলো সেসব নি‘আমতের শুকরিয়া। এছাড়া সালাত আল্লাহর দাসত্বের উৎকৃষ্ট নমুনা। যেহেতু সালাতে বান্দা আল্লাহর প্রতি মনোযোগ দেয়, নতশির হয়, একনিষ্ঠ হয়ে তারই কাছে তিলাওয়াত, যিকর ও দো‘আর মাধ্যমে মুনাজাত করে। এমনিভাবে এতে রয়েছে এমন সম্পর্ক যা বান্দা ও তার রবের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে এবং পার্থিব জগতের উর্ধ্বে উঠে

[38] সূরা মায়েদা (৫) : ১২

পরিচ্ছন্ন অন্তর ও প্রশান্তির জগতে নিয়ে যায়। মানুষ যখনই পার্থিব জীবনের মোহে ডুবে যায় তখন সালাত সেসব মায়া মুক্ত করে এবং তাকে বাস্তবতার সামনে দাঁড় করায় যার সম্পর্কে সে উদাসীন। সালাত তাকে স্মরণ করে দেয় যে, সে বাস্তবতা অনেক বড়। এ জীবন এত দৃঢ়ভাবে সৃষ্টি ও মানুষের জন্য সব কিছু অধিন্যস্ত করে দেওয়া শুধু জীবন যাপনের জন্য নয়; বরং এ জীবন থেকে অন্য জীবনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি।

সালাতের আদেশ:

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর।[39] অন্যত্র বলেছেন-

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

এবং তোমরা আল্লাহর পথে সাধনা কর, যেমন সাধনা করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন (-কে আঁকড়ে ধর)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম

[39] সূরা বাকারা (২) : ৪৩

কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।[40]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে (উম্মতে মুহাম্মাদী) সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন অন্য উম্মতেরা অস্বীকার করে বলবে যে, নবীগণ আমাদের নিকট দ্বীনের কথা পৌঁছাননি তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে-নিশ্চয় নবীগণ দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এটা আল্লাহর বড় নিআমত। এ নিআমতের শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং তাঁকে মজবুতভাবে ধরার আদেশ করেছেন।

এ থেকে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি এও বোঝা যায়, এই নিআমতের শুধু মৌখিক শোকরিয়া আদায় করা যথেষ্ট নয়; বরং আমলগতভাবেও শোকরিয়া আদায় করতে হবে। যে সকল আমল দ্বারা এ নিআমতের শোকরিয়া আদায় করা যায় তার শীর্ষে রয়েছে নামায, যাকাতসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। অপর আয়াতে নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন-

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰل.

আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না।[41]

এখানে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামাযের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং

[40] সূরা হজ্ব (২২) : ৭৮

[41] সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩১

কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে। অন্যত্র আল্লাহ সরাসরি নবীজীকে নামাযের আদেশ করেছেন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের নামায (কায়েম কর)। নিশ্চয় ফজরের নামাযে সমাবেশ ঘটে।[42]

সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা কোন্ কোন্ নামায বুঝানো হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও সীরাতে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তা হল, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায। আর ফজরের নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর বিশেষত্বের একটি দিক হল এ সময়ে ফিরিশতাদের সমাবেশ ঘটে থাকে। নবীজীকে নামাযের আদেশ করে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

এবং তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এ একটি স্মারক।[43] দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম দ্বারা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায বুঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাহয় এর পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে।

আমরা লক্ষ করেছি এখানে নামাযের আদেশ করা হয়েছে, সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, পুণ্য পাপকে দূর করে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় নামায খুব মর্যাদাপূর্ণ আমল এবং এর দ্বারা গোনাহ মাফ হবে। নবীজীকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন-

---

[42] সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭৮

[43] সূরা হূদ (১১) : ১১৪

أُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।[44]

এখানেও নামাযের আদেশ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর কিছু উপকারিতাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। হাঁ, নামাযের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। তবে প্রাণবন্ত নামায হতে হবে। যেরূপ নামাযের কথা কুরআন ও হাদীস বলে।

কুরআন হুকুম-আহকাম আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত পুংলিঙ্গের সম্বোধন করে। দ্বিমত নেই যে, পুরুষের মত মহিলারাও এসব আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত। কুরআনে এক স্থানে নবীপত্নীদের বিশেষভাবে সম্বোধন করে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাতে নামাযের আদেশও রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন-

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

হে নবী পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ কোনো নারীর মত নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা কোমলভাবে কথা বলো না, অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসায় পড়বে আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বল। এবং তোমাদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহিলিয়াতের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না এবং নামায কায়েম কর। যাকাত আদায় কর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার!

[44] সূরা আনকাবুত (২৯) : ৪৫

আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবে পবিত্র করতে।[45]

আদেশমাত্রই গুরুত্বপূর্ণ। আদেশকারীর মর্যাদা এবং আদেশের ধরন ও অবস্থা অনুপাতে গুরুত্ব আরো বেশি হয়। আদেশকারী যত বড় হয় আদেশ তত বেশি গুরুত্ব বহন করে। এমনিভাবে যখন বারবার ও বিভিন্নভাবে আদেশ করা হয় তখনো আদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নামাযের আদেশ যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ করেছেন যিনি সবচেয়ে বড় এবং বিভিন্নরূপে করেছেন, সরাসরি বান্দাদের করেছেন, নবীর মাধ্যমে করেছেন, সরাসরি নবীকে করেছেন, নবীপত্নীদের করেছেন, তাই নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশি।

বাচ্চাদের সালাতের নির্দেশ:

বাচ্চাদের সাত বছর বয়স হলে সালাতের আদেশ দিতে হবে। দশ বছর হলে সালাত আদায় না করলে মৃদু প্রহার করতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে,

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে সালাত পড়ার নির্দেশ দাও, যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে তখন সালাত না পড়লে এ জন্য তাদের শাস্তি দাও এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও"।[46]

---

[45] সূরা আহযাব (৩৩) : ৩২-৩৩

[46] আবূ দাঊদ ৪৯৫, সহীহুল জামে' ৫৮৬৮

সালাত কায়েমের উদ্দেশ্য:

সালাত হল আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সালাতে মূলত আল্লাহর প্রশংসা ও নিজেদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। সালাত ফরজ ইবাদত, সালাতে শুধুমাত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে সম্পাদন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে যেভাবে আদেশ করেছেন:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।[47]

আকিমুস সালাত' বা 'নামাজ কায়েম করা' বলতে কী বুঝায়?

কোরআনে উল্লেখিত 'আকিমুস সালাত' বা 'নামাজ কায়েম করা' কথাটির অর্থ হচ্ছে, প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বহুবার নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কোরআনে আল্লাহ অনেকভাবেই নামাজের কথা বলেছেন এবং প্রায় ১৮ জায়গায় তিনি আদেশসূচকভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। 'নামাজ কায়েম' বলতে আমরা সাধারণত নামাজের অনুষ্ঠান বাস্তবায়নকে বুঝি। অর্থাৎ নিজে নামাজ পড়া অন্যদেরকে নামাজ পড়তে উৎসাহিত করাই হচ্ছে 'আকিমুস সালাত' বা 'নামাজ কায়েম'। আসলে আকিমুস সালাত বলতে কী বুঝায়?

নামাজ প্রতিষ্ঠা দুই ধরণের হতে পারে : (১) ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠা, (২) সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা।

ব্যক্তির মধ্যে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তির মধ্যে নামাজ প্রতিষ্ঠা দুই ধরণের হতে পারে :

(ক) নামাজকে ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা :

উদাহরণত, আমরা অনেকেই স্মার্টফোন ইউজ করি। আপনারা জানেন, এসব স্মার্ট ফোনে কিছু এপস বা কিছু প্রোগ্রাম প্রথম থেকেই ইন্সটল করা থাকে আবার কিছু প্রোগ্রাম পরবর্তীতে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে ইন্সটল করি। ঠিক তেমনি আল্লাহ

[47] আল-কুরআন, সূরা-ত্বোয়া-হা 20:14

তায়ালা আমাদের দেহে কিছু প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার বা এপস শুরু থেকেই ইন্সটল করে দিয়েছেন। যেমন আমরা নিঃশ্বাস নেই, ক্ষুদা লাগলে খাই, ক্লান্তি লাগলে ঘুমাই ইত্যাদি। এরপর আমরা যখন আস্তে আস্তে বড় হই, তখন কিছু কিছু ব্যাপার আমরা নিজেরা নিজেদের খুশিমত ইন্সটল করে নিই। যেমন, কেউ গল্পের বই পড়তে পড়তে প্রচুর সময় ব্যয় করি, কেউ প্রচুর খেলাধুলা করি ইত্যাদি। আমরা যারা যেগুলো ইন্সটল করে নিয়েছি সেগুলো ছাড়া আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। কোনো কারণে খেলতে না পারলে বা বই না পড়তে পারলে আমাদের অস্বস্তি লাগে। এটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিতকরণ। অর্থাৎ এই বিষয়গুলো আমরা নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছি। ঠিক তেমনি নামাজও এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয় আছে। কেউ যদি নামাজকে তার নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নেয়, তখন নামাজের ওয়াক্ত হওয়া মাত্রই সে অস্থির হয়ে পড়বে। নামাজ পড়ার জন্য তার মন আনচান করবে। তাদের অন্তর থাকবে মসজিদের সাথে লাগোয়া।

আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। এর মধ্যে এক ধরণের ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে।[48]

এখন এই নামাজকে নিজেদের মধ্যে ইন্সটল বা প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি হচ্ছে, বারবার নামাজ পড়া। নামাজের প্রতি সচেতন থাকা। নামাজ না পড়ার শাস্তি এবং আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার শাস্তি স্মরণ করা। এভাবে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে নামাজ আমাদের শরীরে এবং অন্তরে নামাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। ইনশা-আল্লাহ।

(খ) নামাজের শিক্ষাকে ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা :

শুধু নামাজ আদায় করেই নয়, বরং নামাজ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে সেই শিক্ষা নিজের যাপিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাও নামাজ কায়েম তথা নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ নামাজ নিয়মিত পড়েও যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের শিক্ষাকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে না পারেন, নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন তাহলে তিনি পরিপূর্ণ নামাজ কায়েম করতে পারেননি। তাই নামাজ আদায়ের সাথে সাথে নিজের জীবনে নামাজের শিক্ষাকেও কায়েম করা কর্তব্য। এটিও আকিমুস সালাতের অংশ।

[48] বুখারি : ৬২৭

তবে এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, নামাজের যে পদ্ধতিগত আচরণ রয়েছে, সেটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের সাথে ধর্তব্য। এর বাইরে 'দায়েমি সালাত' বলতে কিছু নেই। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ বা ভেতরগত নামাজের কোনো অস্তিত্ব নেই। কোরআনে যে 'নামাজে সর্বদা নিষ্ঠাবান' থাকার কথা বলা হয়েছে, সেটি নামাজের শিক্ষাকে নিজের জীবনে ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন- "নিশ্চয়ই সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।[49]

প্রখ্যাত মুফাসসীর হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. বলেন, "সালাতে খুশূ-খুযূ (ধ্যান ও বিনয়) তারই অর্জন হয়, যে নিজের অন্তরকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে শুধু সালাতের মধ্যেই নিবিষ্ট রাখে।[50]

যখন কেউ এমন ধ্যানের সাথে সালাত আদায় করে তখনই সালাত তার চক্ষু শীতল করে, অন্তরের প্রশান্তির কারণ হয়। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন- "সালাতেই দান করা হয়েছে আমার চক্ষুর শীতলতা।[51]

এটাই তো সালাত সম্পর্কে একজন মুমিনের অনুভূতি হওয়া উচিত। সালাত তার জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল, অন্তরের প্রশান্তি, শান্তির আধার। পক্ষান্তরে মুনাফিক এবং যারা সালাতে ধ্যান ও বিনয় অবলম্বন করে না, তাদের জন্য সালাত মহা কঠিন কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- "সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়। তবে খুশূ-খুযূ (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়) অবলম্বনকারীদের জন্য নয়।[52]

আরেক আয়াতে মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন- "(নিশ্চয়ই মুনাফিকরা) যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।[53]

সতুরাং নামাজে ধ্যানমগ্নতা ও বিনয়াভাব হচ্ছে মুমিনের গুণ। পক্ষান্তরে ধ্যান ও বিনয়বিহীন অলসতার সাথে নামাজ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। আর ধ্যানমগ্ন ও বিনয়াবনত

---

[49] সূরা আনকাবূত : ৪৫

[50] তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩ খণ্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা

[51] মুসনাদে আহমাদ, সুনানে নাসাঈ

[52] সূরা বাকারা : ৪৫

[53] সূরা নিসা : ১৪২

নামাজই নামাজিকে সকল অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে, তাকে নামাজে সার্বক্ষনিক নিষ্ঠাবান রাখে। নামাজের শিক্ষাকে নিজের জীবনে ধারণ করার সক্ষমতা দান করে।

মোটকথা, নামাজের শিক্ষাটা আসবে প্রাকটিক্যাললি নামাজ পড়া থেকে, নামাজ পড়ার ধ্যানেই রয়েছে নামাজের শিক্ষা। নামাজের বাইরে নামাজের শিক্ষা নিতান্তই বাগাড়ম্বর।

হযরত সাদ বিন উমারাহ রা. এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন- ‘‘যখন তুমি সালাত আদায় কর, তো এমনভাবে আদায় কর যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ সালাত।[54]

প্রসিদ্ধ হাদীস ‘হাদীসে জিবরীল’-এ ইবাদতের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে ফুটে উঠেছে ধ্যানমগ্নতা ও বিনয়ভাব কাকে বলে? দেখুন হাদিসটি : ‘‘ইহসান হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তো (অবশ্যই) তোমাকে দেখছেন।[55]

[54] আলমুজামুল কাবীর, তবারানী

[55] বুখারি

নামাজকে সমাজে প্রতিষ্ঠা:

সমাজে নামাজ প্রতিষ্ঠা দুইভাবে হতে পারে।

ক- ফরজ নামাজ জামায়াতের সাথে পড়ে নামাজকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা :

নামাজের আরকান-আহকামসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মানুষকে শিক্ষা দিয়ে, মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে নামাজ পড়তে পারার ব্যবস্থা করা। যখনই নামাজের আজান হবে, তখন সকল কাজ বাদ দিয়ে নামাজে অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করা। ইসলামিক সমাজে সকল মুসলিমের জন্য নামাজের জামায়াতে শরিক হওয়াকে বাধ্যতামূলক করা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, জুমআর দিন যখন নামাজের জন্যে (আজানের মাধ্যমে) ডাকা হয়, তখন বেচা-কেনা রেখে নামাজের দিকে দ্রুত চলে যাও। এটি তোমাদের জন্যে উত্তম যদি জানতে।[56] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।[57]

এভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা এবং তা নিয়মিত পালন ও এর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানেরও। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তারাই ওইসব লোক, যাদেরকে যদি আমি দুনিয়াতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, তারা নামায কায়েম করে, যাকাত চালু করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের শেষ ফল আল্লাহরই হাতে।[58]

এই জামায়াতে নামাজ পড়া যে কতটা জরুরি, এই প্রসঙ্গে রাসূলের হাদিস দেখতে পাই, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করে বলেন, আমার এরূপ ইচ্ছা হয় যে, আজানের পর কাউকে ইমাম বানিয়ে নামাজ শুরু করার আদেশ দেই এবং আমি ওইসব লোকের বাড়ি খুঁজে বের করি; যারা

---

[56] সূরা জুমআ: ৯

[57] সূরা বাকারার ৪৩ নং আয়াতে

[58] সূরা হজ্বের : ৪১

নামাজের জামাতে শরিক হয়নি এবং কারও দ্বারা জ্বালানি কাঠ আনিয়ে তাদের ঘরে থাকা অবস্থায় বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেই।[59]

এছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাজীবন জামাতের সঙ্গেই নামাজ আদায় করেছেন। এমনকি ইন্তিকালপূর্ব অসুস্থতার সময়ও জামাত ছাড়েননি। সাহাবায়ে কেরামের পুরো জীবনও সেভাবে অতিবাহিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যেভাবে আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখো, সেভাবে নামাজ আদায় করো।[60]

খ- নামাজ প্রতিষ্ঠার সামাজিক শিক্ষা :

আল্লাহর প্রতি ঈমানের সূত্রে যারা পরস্পরে ভাই ও বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, তাদের পরস্পরে পরিচিতি লাভ। তাদের মাঝে মহব্বত ও ভালোবাসা জোরদার করে তোলা।

মুসলমানদের মাঝে বিভিন্নতার অবসান ঘটিয়ে সংঘবদ্ধতা গড়ে তোলা এবং উত্তম ও ভালো কাজের প্রতি তাদের সকলের হৃদয় আকৃষ্ট করা।

মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মনোভাব জোরদার করা।

মুসলমানদের অন্তরসমূহ এককাতারে বেঁধে দেয়া। কেননা, একই কাতারে সাদা কালো, আরবি-আজমি, আবাল-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক কাতারে এক ইমামের পিছনে, একই সময়ে, এক কিবলাকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

গুনাহ মাফ হওয়া এবং দরজা বুলন্দ হওয়া। আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের পথ দেখাব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ মাফ করে দেন এবং দরজা বুলন্দ করেন? তারা বললেন, নিশ্চয় দেখাবেন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও উত্তমরূপে অজু করা, মসজিদ পানে অধিক পদচারণা, এক নামাজের পর অন্য নামাজের

[59] বুখারি

[60] বুখারি

অপেক্ষায় থাকা। এটাই হলো রিবাত তথা আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা।[61]

একা নামাজ পড়ার তুলনায় জামাতের সাথে নামাজ পড়ার সওয়াব বেশি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জামাতের সাথে নামাজ আদায় একা নামাজ আদায়ের চেয়ে সাতাশগুন বেশি ফজিলতপূর্ণ।[62]

সর্বোপরি, আমরা যাতে নামাজকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সেজন্য জোরপ্রচেষ্টা চালাতে হবে। নিয়মিত নামাজ আদায় তো করতেই হবে, পাশাপাশি এর শিক্ষাও বাস্তবায়ন করতে হবে, নতুবা আমাদের নামাজ কায়েমের হক আদায় হবে না। আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবো। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রকৃতভাবে নামাজ কায়েমের তাওফিক দান করুন।

সালাতের হুকুম ও এর সংখ্যা:

সালাত দু'ধরণের: ফরয ও নফল সালাত। ফরয সালাত আবার দু'প্রকার: ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া। ফরযে আইন সালাত প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নর-নারীর পর ফরয। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরযে আইন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا

নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয"।[63]

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ

[61] মুসলিম

[62] বুখারি

[63] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩

আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হলো সঠিক দীন।[64]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর। আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, এ কথার সাক্ষ্য দান, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া”।[65]

নাফে‘ ইবন আযরাক ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কুরআনে পেয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পেয়েছি। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ - وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ

অতএব, তোমরা আল্লাহর তাসবীহ কর, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং সকালে উঠবে। আর অপরাহ্নে ও জোহরের সময়ে। আর আসমান ও যমীনে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।[66]

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ . فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ

“নজদবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কথার মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কী বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে কাছে এসে ইসলাম

[64] সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫

[65] رواه البخاري ومسلم

[66] সূরা আর-রূম, আয়াত: ১৭-১৮

সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। সে বলল, আমার ওপর এ ছাড়া আরও সালাত আছে?’ তিনি বললেন, না; তবে নফল আদায় করতে পার।[67]

কুরআন ও হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত

ফজর-মাগরীব:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

"আর দিনের দুই প্রান্তেই সালাত ঠিক রাখবে এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।[68]

যোহর-আসর:

আল্লাহ সুব. তাআলা বলেন, حَٰفِظُوا عَلَى الصَّلَوَٰتِ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطَىٰ

তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের। [69]

এশা:

আল্লাহ সুব. তাআলা বলেন, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا "সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়।[70]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

---

[67] বুখারী (অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুঃ ইসলামে যাকাত বিধান, হাঃ ৪৬) মুসলিম (অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুঃ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ সালাত সম্পর্কে বর্ণনা) মালিক সূত্রে।

[68] সূরা হুদ: ১১৪

[69] সূরা আল-বাকারাহ: ২৩৮

[70] সূরা বনী ঈসরাইল: ৭৮

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর সন্ধ্যায় মাগরিব ও এশার সালাত দ্বারা ও প্রভাতে ফজর সালাত দ্বারা এবং অপরাহ্নে আসরের সালাত দ্বারা দ্বারা) ও যোহরের (যোহরের সালাত দ্বারা) সময়। আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই।[71]

সূরা রূমের উক্ত আয়াতে একই সাথে ৫ ওয়াক্ত সালাতের সময় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম যে সালাত একথা সর্বজন স্বীকৃত বিষয়।[72]

হাদীসের আলোকে সালাত

ক. রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"ইসলাম পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল-এ সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, সাওম পালন করা এবং বাইতুল্লাহ-এর হজ্ব করা।[73]

খ. তালহা ইবনে 'উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নাজদের বাসিন্দা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমাতে আসলো। তার মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুন গুন আওয়াজ শুনছিলাম কিন্তু সে কী বলছিল তা বুঝা যাচ্ছিলো না। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অতি নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস

71 সূরা রোম: ১৭, ১৮

72 তাফসীরে রুহুল মাআনী: ৮/২৯

73 সহীহ বোখারী: ৮, মুসলিম: ১৬

করল।

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُنَّ قَالَ " لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُ فَقَالَ " لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত'সে বলল, এ ছাড়া আমার কোন কিছু (সালাত) আছে কি? তিনি বললেন, না তবে নফল আদায় করতে পার।[74]

গ. সালাত হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন এবং পাপ মোচনের নদী: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوا : لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

"মনে কর তোমাদের কারো দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে, এতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে কি? তারা বললেন: জি না, তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে না। তিনি বললেন: এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ, এর দ্বারা আল্লাহ সকল পাপ মোচন করে দেনা"।।[75]

ঘ. রাসূলুল্লাহ বলেন, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّه

"যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর সাথেই নিভৃতে আলাপ করে।[76]

৬. নবী কারীম এর আরো এরশাদ করেন, بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاة ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ছেড়ে দেয়া।[77]

[74] সহীহ মুসলিম: ৪

[75] সহীহ বোখারী: ৫২৮, মুসলিম: ৬৬৭

[76] সহীহ বোখারী: ৩৯০

[77] মুসলিম

ইসলামে সালাতের বিধান কি? কার উপর সালাত ফরয?

ছালাত ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রুকন; বরং এটা কালেমায়ে শাহাদাতের পর দ্বিতীয় রুকন। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটা ইসলামের মূল খুঁটি। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

ইসলামের মূল খুঁটি হচ্ছে, ছালাত।[78] আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ছালাত ফরয করেন এমন উঁচু স্থানে যেখানে মানুষের পক্ষে পৌঁছা অসম্ভব। কোন মাধ্যম ছাড়াই রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ একটি রাত মে'রাজের রাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সপ্তাকাশের উপর আরশে নিয়ে এই ছালাত ফরয করেন। প্রথমে রাত-দিনে ছালাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতি দয়া করে এর সংখ্যা কমিয়ে নির্ধারণ করেন পাঁচ ওয়াক্ত। আর প্রতিদান ঘোষণা করেন পঞ্চাশ ওয়াক্তের বরাবর। এ থেকে প্রমাণিত হয় ছালাত কত গুরুত্বপূর্ণ। ছালাতকে আল্লাহ্ কত ভালাবসেন। সুতরাং মানুষের জীবনের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ সময় এই ক্ষেত্রে ব্যয় করা অত্যন্ত জরুরী। ছালাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে দলীল হচ্ছে: কুরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলমানদের এজমা বা ঐকমত্য।

কুরআন থেকে দলীলঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

অর্থঃ "যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন নামায প্রতিষ্ঠা কর; নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয করা হয়েছে।[79]

[78] তিরমিযী ২৬১৬, হাসান সহীহ

[79] সূরা নিসা: ১০৩

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মু'আয বিন জাবাল (রা:)কে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন তাকে বলেনঃ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

তুমি তাদেরকে শিক্ষা দিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিদিন (দিনে-রাতে) তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন।[80]

ছালাত ফরয হওয়ার উপর সমস্ত মুসলমান ঐকমত্য হয়েছে। এ জন্য উলামাগণ (রহ:) বলেন, কোন মানুষ যদি পাঁচ ওয়াক্ত বা কোন এক ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের মুরতাদ ইসলাম থেকে বহিস্কৃত। তার রক্ত ও সম্পদ হালাল। কিন্তু যদি সে তওবা করে তার কথা ভিন্ন। অবশ্য উক্ত ব্যক্তি যদি নতুন মুসলমান হয়- ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং অনুরূপ কথা বলে তবে তার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে। তাকে উক্ত বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। তারপরও যদি সে ছালাত ফরয হওয়ার বিষয়টিকে অমান্য করে তবে সেও কাফের বলে গণ্য হবে।

নিম্নলিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ছালাত ফরযঃ

মুসলিম, বালেগ, আকেল, নারী বা পুরুষ।

প্রাপ্ত বয়স্কঃ যার মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কোন একটি চিহ্ন প্রকাশ পাবে তাকেই বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক বলা হবে। উক্ত চিহ্ন পুরুষের ক্ষেত্রে তিনটি আর নারীর ক্ষেত্রে চারটি।

ক) পনের বছর পূর্ণ হওয়া।

খ) উত্তেজনার সাথে নিদ্রা বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়া।

---

80 صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 19

গ) নাভীমূল গজানো। অর্থাৎ- লজ্জাস্থানের আশে-পাশে শক্ত লোম দেখা দেয়া। এ তিনটি চিহ্ন নারী পুরুষ সবার ক্ষেত্রে প্রজোয্য। নারীর ক্ষেত্রে চতুর্থ চিহ্নটি হচ্ছে, হায়েয বা ঋতুস্রাব হওয়া। কেননা তা বালেগ হওয়ার আলামত।

আকেল বা বুদ্ধিমান হচ্ছে বিবেকহীন পাগলের বিপরীত শব্দ। কোন নারী বা পুরুষ যদি অতি বয়স্ক হওয়ার কারণে হিতাহীত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তবে সেও এ শ্রেণীর অন্তর্গত হবে। এ অবস্থায় বিবেকহীন হওয়ার কারণে তার উপর ছালাত ফরয হবে না।

ঋতুস্রাব বা নেফাস হলে ছালাত ওয়াজিব নয়। কেননা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُم

"নারী কি এমন নয় যে, সে ঋতুবতী হলে নামায পড়বে না, রোযা রাখবে না?[81]

সালাত আদায়কারী মুমিনদের বৈশিষ্ট্য:

একমাত্র মুমিনই আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল। আর কুরআনে বহু জায়গায় মুমিনদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ বস্তুত নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করছেন যে, যদি মুমিন হও তাহলে নামায কায়েম কর। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْن

তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনয়ী।[82]

---

[81] متَّفقٌ عليه

[82] সূরা মায়েদা (৫) : ৫৫

এখানে মুমিনদের বন্ধু কারা এ প্রসঙ্গে কেবল তিন শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হয়েছে : ক. আল্লাহ। খ. রাসূল। গ. মুমিনগণ। তারপর এই মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায কায়েম করে। আল্লাহ আরো বলেন-

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ত্ব-সীন। এ কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত; মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ- যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।[83] এ আয়াতেও মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে নামাযের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের রবেরই উপর ভরসা করে। যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।[84]

এখানে সত্যিকার মুমিনদের গুণাবলি কী তা আলোচনা করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা গেল সত্যিকার মুমিন হতে হলে নামায আদায় করতে হবে। নামায ছাড়া সত্যিকার মুমিন হওয়া যাবে না। আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ

[83] সূরা নামল (২৭) : ১-৩

[84] সূরা আনফাল (৮) : ২-৪

مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা তাদের নামাযে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত আদায়কারী, যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসীদের থেকে নয়, কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। তারাই উত্তরাধিকার লাভকারী, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।[85]

এ আয়াতে সফল মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা তাদের নামাযে বিনীত (خٰشِعُوْنَ)। এ শব্দটি خُشُوْع থেকে নির্গত। خُشُوْع শব্দের অর্থ হচ্ছে বিনয়। কখনো ভয়, প্রশান্তি ও স্থিরতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আসলে এ বিষয়গুলো কাছাকাছি।

خُشُوْع কুরআনে একাধিক স্থানে অন্তরের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উপরিউক্ত আয়াতে সাধারণভাবে বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, সফল মুমিন তারা, যারা নামাযে পরিপূর্ণরূপে বিনীত, আন্তরিকভাবেও এবং শারীরিকভাবেও। তাদের বিনয় অন্তর-জগৎকে ছাড়িয়ে দেহ-জগৎকে প্লাবিত করে। তাদের বিনয় ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে বহিরঙ্গকে আলোকিত করে।

বিনয় মানে কী আমরা সবাই জানি- নিজেকে ছোট মনে করা। তো বিনয়ের সঙ্গে নামায পড়ার অর্থ হল নিজেকে ছোট, দুর্বল, অসহায় ও মুখাপেক্ষী মনে করে আর

[85] সূরা মুমিনুন (২৩) : ১-১১

আল্লাহকে সবচেয়ে বড় মনে করে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর সম্মুখে নিজের বন্দেগী নিবেদন করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর জন্য দেহমনের উপস্থিতির বিকল্প নেই।

এই খুশূ-ই হচ্ছে নামাযের রূহ। আসলে খুশূ মুমিনের সবসময়কার অবস্থা। এখানে বিশেষভাবে নামাযের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, নামায হচ্ছে খুশূর প্রকাশের সর্বোত্তম জায়গা।

সফল মুমিনদের দ্বিতীয় গুণ হল তারা তাদের নামাযমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। এই যত্নের মধ্যে সময়মত নামায পড়া, নিয়মিত নামায পড়া এবং নিয়মনীতি, হক ও আদবসমূহ লক্ষ করে নামায পড়া সবই শামিল।

অপর সূরায় আল্লাহ নামাযীদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেছেন-

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْن

যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত। এবং যাদের সম্পদে আছে নির্ধারিত হক, যাচক ও বঞ্চিতের জন্য। এবং যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি এমন নয় যে, তা থেকে নির্ভয় থাকা যায়। এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তাদের স্ত্রী বা তাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া। কেননা (এ ক্ষেত্রে) তারা নিন্দনীয় নয়। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা আপন সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করে।

এবং যারা তাদের নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে। তারা জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে।[86]

এখান থেকে আমরা প্রকৃত নামাযীর পরিচয় জানতে পারলাম। প্রকৃত নামাযী হচ্ছে যার মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলি বিরাজমান থাকে, যেগুলোর শীর্ষে রয়েছে নিয়মিত নামায পড়া এবং যত্নের সাথে নামায পড়া।

মজার ব্যাপার এই যে, সূরা মুমিনুনে উল্লেখিত সফল মুমিনের সাতটি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সম্পর্কিত। এমনিভাবে সূরা মাআরিজে উল্লেখিত নামাযীর নয়টি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সংক্রান্ত এবং উভয় সূরায় গুণগুলোর আলোচনা শুরু হয়েছে নামায দিয়ে এবং শেষও হয়েছে নামায দিয়েই। এ থেকে অনুমেয়, নামায কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঈমানের সাথে এর কী গভীর সম্পর্ক!

হাদীসের আলোকে সেরা সালাত:

নামায- ইসলামী শরীয়তে ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। প্রতিদিনের নিয়মিত যে ফরজ-ওয়াজিব এবং সুন্নতে মুআক্কাদা নামায রয়েছে, এসব তো আমাদের জন্যে অবধারিত। এর কোনো বিকল্প নেই। এর বাইরে আছে নফল নামায। ফরযের পাশাপাশি নফল নামাযের কথাও পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বারবার আলোচিত হয়েছে।

সকল ইবাদতের সেরা ইবাদত নামায। প্রশ্ন হল, এই নামায কীভাবে সেরা নামায হিসেবে পরিগণিত হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন- طول القنوت. দীর্ঘ ‘কুনূত’।[87]

---

[86] সূরা মাআরিজ (৭০) : ২৩-৩৫

[87] -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৫৬

এ ‘কুনূত’ শব্দ দিয়ে এখানে কী উদ্দেশ্য- এ বিষয়ে ইমাম নববী রাহ.-এর ভাষ্য হল, দীর্ঘ কুনূত মানে দীর্ঘ কিয়াম। দীর্ঘ সময় ধরে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকা। আর দাঁড়িয়ে থাকা মানেই কুরআন তিলাওয়াত চালিয়ে যাওয়া।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর নির্দেশ- يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا، نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا، اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا হে কম্বলাবৃত! রাতে (নামাযে) দাঁড়িয়ে থাকো, কিছু অংশ ব্যতীত। অর্ধরাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম। অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি। আর কুরআন তিলাওয়াত করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।[88]

এ আদেশের বাস্তবায়ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে কীভাবে ঘটেছিল, এর একটি নমুনা আমরা লক্ষ করি হযরত মুগীরা ইবনে শু‘বা রা.-এর এ হাদীসে-

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন (দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে) তাঁর পা ফুলে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ তো আপনার আগের-পরের সবকিছু ক্ষমা করে দিয়েছেন! (এরপরও কেন আপনি এত কষ্ট করছেন?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا আমি কি তবে (আল্লাহ তাআলার) একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না![89]

আরেকটি উদাহরণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রাতে নফল নামাযে দাঁড়ালেন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাঁর সঙ্গে নামাযে শরীক হলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায এতটাই দীর্ঘ করছিলেন,

---

[88] সূরা মুযযাম্মিল (৭৩) : ১-৪

[89] সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৩৬

যার সঙ্গে পেরে না উঠে হযরত ইবনে মাসউদ রা. নামায ছেড়ে দিতে চাইলেন। তার বক্তব্য এমন-

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى
هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক রাতে নামায পড়ছিলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একপর্যায়ে আমি এক মন্দ চিন্তা করতে লাগলাম। উপস্থিত ব্যক্তিরা জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কী চিন্তা করেছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন- هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم আমি চাইছিলাম, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এ নামায ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ি![90]

হযরত ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে যারা জানেন, তারা জানেন- নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের প্রতি তিনি কতটা যত্নবান ছিলেন! নবী-পরিবারের সদস্য না হয়েও তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তা সাহাবায়ে কেরামের কাফেলার মধ্যেও বিরল। স্বাভাবিক কথা, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাযের দীর্ঘতা সম্পর্কেও জেনে থাকবেন। কিন্তু সে ইবনে মাসউদ রা.-ই যখন নামায ছেড়ে দিতে চাইলেন, এতে সহজেই অনুমেয়- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে রাতের নামায কতটা দীর্ঘ হয়েছিল!

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নফল নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন-

يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَأَلْ عَنْ حُسْنِهِنّ وَطُولِهِنّ ثُمّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَأَلْ عَنْ حُسْنِهِنّ
وَطُولِهِنّ ثُمّ يُصَلِّي ثَلاَثًا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে প্রথমে (দুই রাকাত করে) চার রাকাত নামায পড়তেন। এগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার কথা তুমি জিজ্ঞেস করো না। এরপর

90 সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৩৫

আবার (দুই রাকাত করে) চার রাকাত পড়তেন। তুমি এগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার কথাও জানতে চেয়ো না। এরপর তিন রাকাত (বিতির) পড়তেন।[91]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের মানুষ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব আমল তিনি নিয়মিত দেখে অভ্যস্ত। অথচ সেই আমলের কথা যখন তিনি বর্ণনা করেছেন, কতটা বিস্ময় তার কথায় ঝরে পড়ছে, ভাবা যায়- 'সে রাকাতগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা তুমি জানতে চেয়ো না!'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এলেন তখন আহলে কিতাব, যারা পূর্ববর্তী কোনো আসমানী কিতাবের অনুসারী, এককথায় ইহুদী-খ্রিস্টান, তাদের কেউ কেউ সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল, কেউ আবার মনেপ্রাণে গ্রহণ করল সে দাওয়াত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কথাই শুধু নয়, তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ছিল তাদের কিতাবে। যাদের মধ্যে সত্যসন্ধানী মানসিকতা ছিল, তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে স্বীকার করল। এ শ্রেণির একটি পরিচয় মহান রাব্বুল আলামীন এভাবে দিয়েছেন- مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآىِٕمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُوْنَ. কিতাবীদের একটি দল এমন, যারা রাতের বিভিন্ন প্রহরে নামাযে দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে।[92]

দীর্ঘ সময় নিয়ে নামায পড়া, নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াতে ডুবে থাকা- নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ তালীম গ্রহণ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। পরবর্তী কালেও এ ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়নি কখনো। যুগে যুগেই নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিগণের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- রাতের বেলা লম্বা সময় তারা

---

91 সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৪৭

92 সূরা আলে ইমরান (৩) : ১১৩

নামায পড়তেন। ইমাম তিরমিযী রাহ. হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. সাঈদ ইবনে জুবায়ের রাহ. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন- তারা এক রাকাতে পুরো কুরআন খতম করতেন।[93]

তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, হাদীসে যে দীর্ঘ সময় ধরে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকাকে সর্বোত্তম নামায বলা হয়েছে, এর অর্থ এই নয়- কেবল নামাযের কিয়ামটুকুই দীর্ঘ হবে, আর রুকু-সিজদা ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত হবে; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ছিল এমন- তিনি যখন দীর্ঘক্ষণ নামাযে তিলাওয়াত করতেন, রুকু-সিজদাগুলোও দীর্ঘ করতেন। এভাবে তিনি পুরো নামাযের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতেন। একবারের ঘটনা। রাতের বেলা সাহাবী হযরত হুযাইফা রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়ছিলেন। হুযাইফা রা. নিজে এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন-

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বাকারা পড়তে শুরু করেছেন। আমি ভাবলাম, তিনি ১০০ আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন। ১০০ আয়াত শেষ করে তিনি আরও সামনে পড়তে লাগলেন। তখন ভাবলাম, তিনি হয়তো এক রাকাতেই সূরা বাকারা শেষ করবেন। সূরা বাকারা শেষ করার পর তিনি আরও পড়তে লাগলেন। এক সূরা। এরপর আরেক সূরা। তাঁর কুরআন তিলাওয়াত ছিল খুবই ধীরস্থির। তিলাওয়াতের মাঝে যখন তাসবীহ পাঠের কথা আসত, তিনি তাসবীহ পাঠ করতেন, যখন দুআ করার কোনো বিষয় আসত, তিনি দুআ করতেন, যখন কোনো কিছু থেকে আশ্রয় চাওয়ার প্রসঙ্গ আসত, তিনি তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এরপর সূরা বাকারা থেকে সূরা নিসা পর্যন্ত শেষ করার পর তিনি রুকুতে গেলেন। সেখানে রুকুর তাসবীহ পাঠ করলেন। তাঁর রুকুও ছিল তাঁর কিয়ামের প্রায় কাছাকাছি। এরপর দাঁড়ালেন। এবার দাঁড়ানো অবস্থায়ও রুকুর কাছাকাছি সময় কাটিয়ে দিলেন। এরপর

[93] জামে তিরমিযী, ২৯৪৬ নং হাদীসের আলোচনা

সিজদায় গেলেন। সেখানে সিজদার তাসবীহ পাঠ করলেন। তাঁর সিজদাও ছিল দাঁড়িয়ে থাকার প্রায় কাছাকাছি সময় ধরে।[94]

এভাবে দীর্ঘ সময় নিয়ে কিয়াম, রুকু, কওমা, সিজদা আদায় করার ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এই একটিই নয়। হাদীসের কিতাবে এমন বর্ণনা প্রচুর রয়েছে। এসব ঘটনা থেকে এ ভারসাম্যই প্রমাণিত হয়- নামাযের কিয়াম যখন দীর্ঘায়িত হবে, রুকু-সিজদাও দীর্ঘ হবে।

উল্লেখ্য, এখানে শুরুতে যে হাদীস উল্লেখ করেছি, তাতে যেমন দীর্ঘায়িত নামাযের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, আবার কোনো কোনো হাদীসের মর্ম এমন- সিজদা যত বেশি তত ভালো।

হযরত সাওবান রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত গোলাম। তার এক শিষ্য মা‘দান রাহ. তাকে বললেন, আমাকে আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমলের কথা বলে দিন। সাওবান রা. নীরব রইলেন। মা‘দান আবারও একই আবদার করলেন। সাওবান রা. এবারও নীরব। তিনি তৃতীয়বারের মতো একই আবদার করলে সাওবান রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন-

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السّجُودِ لِلهِ فَإِنّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلاّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

তুমি অধিক পরিমাণে আল্লাহকে সিজদা করো। কেননা তুমি যখনই আল্লাহকে একটি সিজদা করবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করবেন।

94 সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৭২

মা'দান বলেন, একই প্রশ্ন আমি আবুদ দারদা রা.-কেও করেছিলাম। তিনিও আমাকে একই উত্তর দিয়েছেন।[95]

এ তো বলাবাহুল্য- সিজদার আধিক্যের জন্যে প্রয়োজন অধিক সংখ্যক রাকাত। আর রাকাতসংখ্যা বেশি হলে নামায কিছুটা সংক্ষিপ্ত হবে- এ-ও স্বাভাবিক। এ থেকে বোঝা যায়, রাকাতসংখ্যা কম হলেও দীর্ঘ কিয়াম দীর্ঘ সিজদাবিশিষ্ট নামায যেমন সেরা নামায, তেমনি কিয়াম-রুকু-সিজদা সংক্ষিপ্ত হলেও অধিক রাকাত নামায আর অধিক সিজদার পদ্ধতিটিও হাদীস শরীফে স্বীকৃত। অধিক রাকাতের আরও কয়েকটি হাদীস লক্ষ করুন- হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُود

কোনো বান্দা যখনই আল্লাহকে একটি সিজদা করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্যে একটি নেকি লিখে দেন, তার একটি পাপ মিটিয়ে দেন এবং তার এক স্তর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাই তোমরা বেশি পরিমাণে সিজদা করো।[96]

মুসনাদে আহমাদের আরেকটি বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। রবীআ আসলামী রা. নামের এক সাহাবী। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতেন। রাতে এশার নামাযের পর যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে চলে যেতেন, তখনও তিনি প্রায় বসে থাকতেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার বাইরে। যদি কোনো প্রয়োজনে তিনি আবার বেরিয়ে আসেন- এ অপেক্ষায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তিনি নিজেকে এভাবেই বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এমন খেদমতের ফলে একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, রবীআ, তুমি আমার কাছে কিছু চাও, আমি তোমাকে দেব। রবীআ বললেন, 'ইয়া

[95] সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮৮

[96] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৪২৪

রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি একটু চিন্তা করে নিই। এরপর আপনাকে জানাব।’ তার ভাষ্য হল- এরপর আমি নিজে নিজে অনেক ভাবলাম। আমি দেখলাম, দুনিয়া শেষ হয়েই যাবে, এটা অস্থায়ী। আর এখানে আমার যে রিযিক আছে তা-ই আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তা আমার কাছে চলেও আসবে। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার আখেরাতের জন্যে কিছু চাইব। কারণ তিনি তো আল্লাহ তাআলার নিকট বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এরপর আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম, তিনি বললেন, কী করলে, রবীআ! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার কাছে আমার চাওয়া- আপনি আমার জন্যে আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করে আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দেবেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, একথা তোমাকে কে বলে দিয়েছে? আমি বললাম, না, আল্লাহর কসম, কেউ আমাকে বলে দেয়নি; বরং আপনি যখন আমাকে কিছু চাওয়ার কথা বলেছেন, আর আপনি তো আল্লাহর নিকট অনেক মর্যাদাশীল, তখন আমি নিজে নিজেই ভাবলাম; আমি দেখলাম, দুনিয়া অস্থায়ী, তা শেষ হয়ে যাবে। এখানে আমার যে রিযিক তা আমার কাছে আসবেই। তখনই আমি মনে মনে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমি আমার আখেরাতের জন্যে কিছু চাইব। একথা শুনে তিনি দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলেন। এরপর বললেন- إِنِّي فَاعِلٌ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود ঠিক আছে, আমি অবশ্যই তা করব। তবে তুমি আমাকে তোমার নিজের বিষয়ে অধিক সংখ্যক সিজদা দিয়ে সহযোগিতা করো।[97]

উপরে এক হাদীসে সেরা নামাযের পরিচয়ে যে দীর্ঘ ‘কুনূতে’র কথা বলা হয়েছে, এর ব্যাখ্যায় হাদীসবিশারদগণ কেউ কেউ আবার নামাযের খুশু-খুযু অর্থাৎ বিনয় ও একাগ্রতার কথাও বলেছেন। একে আমরা সেরা নামাযের তৃতীয় ব্যাখ্যাও বলতে পারি। আবার উপরোক্ত দুই ব্যাখ্যার পরিপূরকও বলতে পারি। অর্থাৎ খুশু-খুযু যদি থাকে,

[97] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৫৭৯

তবে সে নামায সেরা হবেই- তা কমসংখ্যক রাকাতে দীর্ঘ নামায হোক, সংক্ষিপ্ত কিয়াম-রুকু-সিজদায় অধিকসংখ্যক রাকাত নামায হোক। পবিত্র কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْن -
নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ; যারা তাদের নামাযে বিনয়ী।[98]

এ ব্যাখ্যা ফরয-নফল সব নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নামাযে যদি বিনয় ও একাগ্রতা না থাকে, তবে সে নামায পড়ে কেউ হয়তো দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে, কিন্তু নামাযের পরিপূর্ণ বরকত ও ফযীলত তার হাসিল হবে না। এমনকি যারা নামাযে থাকে অস্থিরচিত্ত, দ্রুততার সাথে রুকু-সিজদা আদায় করে, তাদের জন্যে হাদীস শরীফে উচ্চারিত হয়েছে কঠোর সতর্কবাণী। হযরত আবু আবদিল্লাহ আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-
مَثَلُ الَّذِي لا يُتِمّ رُكُوعَهُ ويَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتينِ لا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو يَعْلَى، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

যে ব্যক্তি (নামায পড়ে ঠিকই, কিন্তু) রুকু ঠিকমত আদায় করে না এবং সিজদায় যেন ঠোকর দিয়ে উঠে যায়, তার দৃষ্টান্ত ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে এক-দুইটি খেজুর খেয়ে উঠে গেল অথচ এই দুটো খেজুর তার কোনো কাজে আসবে না।[99] নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল- أَىّ الصّلاَةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَة ؟ ফরয নামাযের পর সেরা নামায কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন- أَفْضَلُ الصّلاَةِ بَعْدَ الصّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ الصّلاَةُ فِى جَوْفِ اللّيْلِ. ফরযের পর সেরা নামায হচ্ছে- গভীর রাতে আদায় করা নামায।[100]

---

98 সূরা মুমিনূন (২৩) : ১-২

99 আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ৩৭৪৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ২৭২৮ সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস।

100 সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৩

শেষ রাতের নামাযের ফযীলত সম্পর্কেও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীস লক্ষ করুন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

يَنْزِلُ رَبّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلّ لَيْلَةٍ إِلَى السّمَاءِ الدّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَه.

আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতেই দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন। তিনি তখন বলতে থাকেন- কে আছে, আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছে, আমার কাছে চাইবে? আমি তার চাওয়া পূরণ করব। কে আছে আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।[101]

সেরা নামাযের পরিচয় উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি। রাতের শেষ ভাগে যে নামায পড়া হয় তা অন্য সময়ের নামাযের তুলনায় অধিক ফযীলতপূর্ণ। আর শেষ রাতের এ নামায যদি হয় খুশু-খুযু ও বিনয়-একাগ্রতায় পরিপূর্ণ, দীর্ঘ কিয়াম-রুকু-সিজদা সহকারে, তবে তো তা সোনায় সোহাগা। নামায যার এমন হবে, সফলকাম সে হবেই। দুনিয়া-আখেরাতে সর্বত্র। এ সফলতা অনিবার্য।

সালাত অস্বীকারকারীর হুকুম:

কেউ জেনেশুনে সালাত ফরয হওয়া অস্বীকার করলে সে কাফির, যদিও সে সালাত আদায় করে। কেননা সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও উম্মতের ইজমায় মিথ্যারোপ করল। এমনিভাবে যে ব্যক্তি অবজ্ঞা, অলসতা ও অবহেলা করে সালাত ত্যাগ করে, যদিও সে সালাত ফরয হওয়া স্বীকার করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ [التوبة: ٥]

---

[101] সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৫৮

"তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।[102]

জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ِإِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

"বান্দা এবং শির্ক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা"।[103]

জীবনে সালাত কায়েমের ফজিলত ও গুরুত্ব:

ঈমানের পরে মুমিন নর ও নারীর উপরে সবচেয়ে বড় ফরয ইবাদত হলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত সময়মত আদায় করা। আরবী ভাষায় সালাত অর্থ প্রার্থনা। ইসলামের পরিভাষায় সালাত অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেখানো নির্ধারিত পদ্ধতিতে রুকু ু সাজদার মাধ্যমে আল্লাহর যিকর ও দোয়া করা। কুরআন ও হাদীসে এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব আর কোনো ইবাদতকে দেওয়া হয় নি। কুরআনে প্রায় ৮০ স্থানে আল্লাহ সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন। অসংখ্য হাদীসে সালাতের গুরুত্ব বোঝান হয়েছে।

আমরা ইতোপূর্বে তাওহীদের আলোচনায় দেখেছি যে, সালাত বা নামায হলো ইসলামের দ্বিতীয় রুকুন। সালাত এমন একটি ফরয ইবাদত যার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামে সকল বিধান সহজ করে দেওয়া হয়েছে। একজন অসুস্থ মানুষ রোযা কাযা করতে পারেন এবং পরে রাখতে পারেন। একেবারে অক্ষম মানুষ ফিদইয়া- কাফ্ফারা দিতে পারেন। কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে সেই বিধান নেই। সালাতকে অন্যভাবে সহজ করা হয়েছে। তা হলো মুমিন যেভাবে পারেন তা আদায় করবেন। সম্ভব হলে পূর্ণ

---

[102] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫

[103] সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১/ কিতাবুল ঈমান (كتاب الإيمان)

নিয়মানুসারে। না হলে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে, যানবাহনে আরোহণ রত অবস্থায়, পোশাক পরিধান করে, উলঙ্গ হয়ে... যে ভাবে সম্ভব মুমিন তাঁর প্রভুর দরবারে হাযিরা দেবেন। কোনো সূরা, কিরাআত বা দোয়া না জানা থাকলে শুধুমাত্র আল্লাহু আকবার বলে বলে বা তাসবীহ-তাহলীল-এর মাধ্যমে সালাত আদায় করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সময় মত হাযিরা দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের যতক্ষণ হুশ রয়েছে, ততক্ষণ তার দায়িত্ব হলো সময় মত সালাত আদায় করা। আল্লাহ বলেন:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُون "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। যদি তোমরা আশংকিত থাক তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, আর যখন নিরাপদ বোধ করবে তখন আল্লাহর যিক্র কর (অর্থাৎ সালাত আদায় কর) যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।[104]

সালাতকে আমরা দায়িত্ব মনে করি। আসলে সালাত দায়িত্ব নয়, সুযোগ। আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, দিনের মধ্যে পাঁচবার তাঁর সাথে কথা বলে, মনের সকল আবেগ তাঁকে জানিয়ে, তাঁর রহমত, বরকত লাভ করে আমরা ধন্য হব। সালাতই সকল সফলতার চাবিকাঠি।

আল্লাহ বলেন: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون "মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন, যারা অত্যন্ত বিনয় ও মনোযোগিতার সাথে সালাত আদায় করেন।[105]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى সেই ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করতে পারে, যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করে।[106]

---

[104] সূরা বাকারা (২): ২৩৮

[105] [سورة المؤمنون:1-11]

[106] الغاشية Al-Ghaashiya

সালাত হলো মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার একমাত্র পথ। সালাতই মানুষকে পরিশীলিত করে এবং মানবতার পূর্ণতার শিখরে তুলে দেয়। সালাতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে মানসিক দৃঢ়তা ও ভারসাম্য অর্জন করেন এবং মানবীয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে:

إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُون

"নিশ্চয় মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই অস্থিরচিত্ত ও ধৈর্যহারা। বিপদে পড়লে সে অধৈর্য ও হতাশ হয়ে পড়ে। আর কল্যাণ বা সম্পদ লাভ করলে সে কৃপণ হয়ে পড়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম সালাত আদায়কারীগণ (তারা এ মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন।) যারা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) সালাত আদায় করেন।[107]

কুরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:

নামায দ্বীনের খুঁটি। নামাজ মুমিনের নূর। নামাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। নামাজ বেহেশতের চাবি। নামাজ মুমিনের পরিচয়। নামাজ চেহারার উজ্জ্বলতা। নামাজ দিলের নূর। নামাজ শরীরের আরাম। নামাজ সুস্বাস্থ্যের কারণ। নামাজ কবরের সঙ্গী। নামাজ আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম। নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। নামাজ দোযখের প্রতিবন্ধক। নামাজ দোয়া কবুলের মাধ্যম। নামাজ অত্যাধিক নেক অর্জনের হাতিয়ার।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টি করার পর মানুষকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। সে দায়িত্ব-সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনয়ন করা। তাঁকে খালিক বা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেওয়া। তাঁকে রব বা পালনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। রাযযাক বা রিযিকদাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। কুরআন মাজীদকে তাঁর পক্ষ হতে নাযিলকৃত কিতাব বলে বিশ্বাস

[107] সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত নং - ১৫৩

করা। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ইত্যাদি।

ঈমানের আনয়েনের পর দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, যে খালিক সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করা। যে রাযযাক রিযিক প্রদান করেন তাঁর আদেশ পালন করা। যে রব লালন পালন করেন তাঁর ইবাদত করা। আমরা যেহেতু আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনয়ন করেছি অর্থাৎ প্রধান দায়িত্ব পালন করেছি সেহেতু আমাদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে ইবাদাত করা। ইবাদাত দুইভাবে করতে হয়। এক. শরীরের মাধ্যমে। দুই. অর্থসম্পদের মাধ্যমে।

যে সমস্ত ইবাদত করতে শরীরের প্রয়োজন হয় সেসমস্ত ইবাদাত হল— শারীরিক ইবাদাত, যেমনঃ নামাজ ও রোজা। নামাজ পড়তে অর্থ সম্পদ, টাকা-পয়সা, সোনা-গহনার প্রয়োজন হয় না; বরং নামাজ পড়তে শরীর লাগে (দাঁড়াতে হয়, রুকু করতে হয়, মাথাটা জমিনে লাগিয়ে সিজদা করতে হয়, ওঠা-বসা করতে হয় ইত্যাদি)। অনুরূপ রোজার বিষয়টিও (রোজা রাখতে হলে নিজ উদরকে পানাহার থেকে বিরত রাখতে হয় এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে হয়। এসব হচ্ছে শারীরিক ইবাদাত।

আর কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলো সম্পাদন করতে অর্থসম্পদের প্রয়োজন হয়। যেমন: যাকাত ও দান-সাদকা (যাকাত প্রদান করতে টাকা-পয়সা, সোনা-দানার প্রয়োজন হয়। দান সাদকা করতে অর্থসম্পদের প্রয়োজন হয়।

এভাবে শারিরীকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হয়। আবার অর্থ -সম্পদের মাধ্যমেও আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে হয়। উভয় ধরনের ইবাদাত করা আমাদের উপর ফরজ।

শারীরিক ইবাদাতসমূহের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হচ্ছে নামাজ। পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তায়ালা দু'চারবার নয়, প্রায় আশিবার নামাজের আলোচনা করেছেন। কখনো আমাদেরকে নামাজের আদেশ করেছেন। কখনোবা নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোথাও নামাজের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোথাও নামাজ না পড়ার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

নামায দ্বীনের খুঁটি। নামাজ মুমিনের নূর। নামাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। নামাজ জান্নাতের চাবি। নামাজ মুমিনের পরিচয়। নামাজ মুমিন- মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যকারী।নামাজ চেহারার উজ্জ্বলতা। নামাজ গোনাহ মোচনকারী। নামাজ দিলের নূর। নামাজ শরীরের আরাম। নামাজ সুস্বাস্থ্যের কারণ। নামাজ কবরের সঙ্গী। নামাজ দলীল। নামাজ নাজাতের কারণ। নামাজ আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম। নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। নামাজ দোযখের প্রতিবন্ধক। নামাজ দোয়া কবুলের মাধ্যম। নামাজ অত্যাধিক নেক অর্জনের হাতিয়ার। নামাজ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সোপান। নামাজ মুমিনের মেরাজ।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের উপর সর্বপ্রথম নামাজ ফরজ করেছেন। আর কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজেরই হিসাব হইবে।

শরীয়তে ইসলামে নামাজ এতই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যে, যেকোনো উপায়ে আপনাকে নামাজ পড়তেই হবে। ইসলামে সবকিছুর বিকল্প আছে কিন্তু নামাযের কোনো বিকল্প নেই। এ দেহে যত দিন প্রাণ থাকবে, যতদিন হুঁশ থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামাজ পড়তেই হবে। নামাজ ছাড়ার ও কাযা করার কোনো সুযোগ নেই। একটু ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন।

(১) নামাজ পড়তে অযু লাগে। আর অযু করতে পানি লাগে। ধরুন, আপনি এমন এক জায়গায় আছেন যেখানে অযু করার মতো পবিত্র পানি খুঁজে পাচ্ছেন না। এদিকে নামাজের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তখন আপনি কী করবেন? অযুর জন্যে পানি পাচ্ছেন না বলে নামাজ ছেড়ে দিবেন? না, কখনো না। সে অবস্থায় আপনাকে অযুর বিকল্প হিসেবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করতে হবে। শরীয়ত অযুর বিকল্প তায়াম্মুমের বিধান দিয়েছি কিন্তু নামাজের বিকল্প কিছু দেয় নি।

(২) নামাজ পড়তে পাক কাপড় লাগে। পাক কাপড়ের ব্যবস্থা করতে সম্ভব না হলে নাপাক কাপড় পড়ে যথাসম্ভব ধুয়ে নামাজ আদায় করতে হবে।

(৩) নামাজ পড়তে জায়গা পাক লাগে। আল্লাহ তায়ালা পাক জায়গার অভাব রাখেন নি। কবর ও বাথরুম-টয়লেট ব্যাতিত পুরো জমিনটাই উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন: দুই পা, দুই হাটু, দুই হাতের তালু ও কপাল এবং নাক রাখার জায়গাটুকু পবিত্র হলেও নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

(৪) সতর ঢেকে নামাজ আদায় করতে হয়। সতর ঢাকার মতোও কাপড় না থাকলে উলঙ্গ অবস্থায় নির্জনস্থানে নামাজ আদায় করতে হবে। কাপড় নেই বলে নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

(৫) জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে হয়। জামাতে আসার সুযোগ না হলে ঘরে থাকলে ঘরে নামাজ আদায় করতে হবে। দোকানে থাকলে দোকানে। অফিসে থাকলে অফিসে। ক্ষেত-খামারে থাকলে খেত খামারে নামাজ আদায় করতে হবে।

(৬) কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতে হয়। আপনি এমন এক অজানা অচেনা জায়গায় গেলেন যেখানে যাওয়ার পর আপনি কিবলা সনাক্ত করতে পারছেন

না। তখন সময় আপনাকে মনের সাথে বুঝাপড়া করে অর্থাৎ আপনার মনের ঝোঁক যেদিকে প্রবল হবে সেদিকটাকে কেবলা ধরে নামাজ আদায় করতে হবে। তবুও কেবলা চিনি না এ অজুহাতে নামাজ ছাড়া যাবে না।

(৭) ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করতে হয়। ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করতে না পারলে পরে কাযা আদায় করতে হবে তবুও নামাজ ছাড়া যাবে না।

(৮) ফরজ নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করতে হয়। হাঁটুতে, পায়ে বা কোমরে ব্যথা হওয়ার কারণে যদি দাড়ানোর মত ক্ষমতা না থাকে। তাহলে বসে বসে নামজ আদায় করতে হবে। আর যদি বসার ও সুযোগ না থাকে তাহলে শুয়েশুয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করতে হবে। তবুও দাঁড়াতে পারিনা, বসতে পারিনা এই অজুহাতে নামাজ কাযা করা যাবে না।

(৯) নামাজে কেরাত পড়তে হয়। সূরা পড়তে হয়। দেখেন আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে কত সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন নি যে বান্দা! নামাজে সুরা বাকারার মতো লম্বা সূরা দিয়ে নামাজ আদায় করো। আল্লাহ তায়ালা বলেন নি, সুরা আলে ইমরান বা সূরা ইয়াসিন দিয়ে নামাজ আদায় করতে হবে অন্যথায় নামাজ হবে না। এরকম কঠিন বিধান দেন নি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: فاقرءو ما تيسر من القرأن। বান্দা কুরআনের যেখান থেকে তোমার সহজ লাগে সেখান থেকে নামাযে পাঠ করো। শুধু তাই নয় রাব্বুল আলামিন আপনার আমার সহজতার জন্যে সূরা কাউসারের মতো মাত্র তিন আয়াত দিয়ে চল্লিশটা অক্ষর দিয়ে সূরা নাজিল করেছেন। চার আয়াত দিয়ে সুরা ইখলাস নাযিল করেছেন। সুতরাং সুরা কেরাত পারি না এই ছুতানাতা দিয়ে নামাজ ছাড়া যাবে না।

(১০) সফর অবস্থা একটি কঠিন অবস্থা। সফরে গেলে একটা রাত কাটাতেও টাকার প্রয়োজন হয়। এক গ্লাস পানি খেতে চাইলেও টাকা দিয়ে কিনে খেতে হয়। একটু প্রস্রাব করতে হলেও টাকা দিয়ে করতে হয়। সেজন্যে নামাজ পড়তে বান্দার কষ্ট হয় বিধায় আল্লাহ তায়ালা নামাজ কসর করার অনুমতি দিয়েছেন অর্থাৎ সফর অবস্থায় বান্দা চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

দেখুন, সফরে গেলে ফরজ রোজা রাখা বা না রাখার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু নামাজ ছাড়ার কোনো সুযোগ নাই। সুতরাং এবার বুঝুন আপনার আমার উপর নামাজের গুরুত্ব কী পরিমাণ।

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر

কেয়ামতের দিন বান্দার কাছে সর্বপ্রথম নামাজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। নামাজের হিসেব নেওয়া হবে। কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে না বান্দা দুনিয়াতে তোমার কয়টা বাড়ি ছিল।কয়টা গাড়ি ছিল? কতখানি জমি ছিল। কোন এলাকার নেতা ছিলা? কোন আসনের এমই ছিলা? এসব বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না।আল্লাহ তায়ালা আপনার আমার কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা রাখবেন তা হচ্ছে বান্দা নিয়মিত নামাজ পড়েছ কিনা? সঠিকভাবে নামাজ পড়েছ কিনা? হিসেব দাও। যদি সঠিকভাবে নামাজের হিসাব দিতে পারে তাহলে সে সফলকাম হয়ে যাবে। আর যদি হিসেবে গরমিল হয় তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। সে ব্যর্থ হয়ে যাবে।[108]

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ونجاة وبرهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিঃ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামাজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে (নামাজ) তার জন্য নূর, দলীল ও নাজাতের উপায় হবে।

[108] তিরমিজি

আর যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে না তার কোনো নূর, দলীল ও নাজাতের ব্যবস্থা হবে না। সে কেয়ামতের দিন কাড়ুন, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে।[109]

উলামায়ে কেরাম বলেন, ধন সম্পদের কারণে যারা নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলো তাদের হাশর হবে কারুনের সাথে। নেতৃত্ব ও রাজনীতির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে ফেরাউনের সাথে।

চাকরি বাকরির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে হামানের সাথে।

ব্যবসা বাণিজ্যর কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে উবাই ইবনে খালফের সাথে।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত ফরমান আসমান থেকে হযরত জিবরাইল আ.কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর নামাজ এমন এক মহান ইবাদাত, যা আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আ কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠান নাই বরং আল্লাহর রাসূল সাহিবে মিরাজ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া থেকে সাত আসমানের উপর তুলে নিয়ে সেখানে নামাজ ফরজ করেছেন। রোজা ফরজ হয়েছে জমিনে আর নামাজ ফরজ হয়েছে আসমানে। যাকাত ফরজ হয়েছে জমিনে আর নামাজ ফরজ হয়েছে আসমানে। অন্যান্য বিধান নাযিল হয়েছে ফেরেশতার মাধ্যমে আর নামাজের বিধান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إني فرضت على أمتك خمسَ صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ...ابن ماجة

নামাজ ফরজ করার পর আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিলাম। আর আমি ওয়াদা দিলাম, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ

[109] মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৫৭৮

নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবে আমি আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি নামাজের হিফাজত করবে না তার জন্যে আমার কোনো ওয়াদা নেই।[110]

কিয়ামতের দিন লক্ষকোটি বনী আদম যখন বিচারের মাঠে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তায়ালা তখন জিজ্ঞেস করবেন, দুনিয়ার বুকে কারা আমাকে সিজদা করেছ? হাত উঠাও, সেদিন সবাই হাত উঠিয়ে বলবে আমরা সিজদা করেছি, নামাজি-বেনামাজি, কাফের-মুশরিক সবাই হাত উঠাবে। কেউ বাদ থাকবেনা। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন ঠিক আছে তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক, এই মুহুর্তে সবাই আমাকে সিজদা করো। তখন সবাই আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় চলে যাবে। সবাই যখন সিজদায় চলে যাবে একদল মানুষ তখন দাঁড়িয়ে থাকবে। সিজদা করতে পারবে না। শত চেষ্টা করেও সিজদা করতে পারবে না। তাদের মেরুদন্ডের হাড্ডিটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাবে। তারা কারা জানেন? বেনামাজীর দল। কেয়ামতের দিন ঐ বেনামজীর দল ধরা খেয়ে যাব। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। চেহারা লাল হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের বলেন, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْن

(স্মরণ করো) যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাটন হয়ে যাবে, তখন তাদের সিজদাবনত হওয়ার আহবান জানানো হবে, এসব হতভাগা ব্যক্তি (কিন্তু সেদিন সিজদা করতে) সক্ষম হবে না।[111]

وقد كانوا يدعون الي السجود وهم سالمون ঐসব লোককে নামাজের জন্য (দৈনিক পাঁচবার আমার ঘর মসজিদে থেকে ডাকা হত) কিন্তু তারা সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও নামাজে আসত না।[112]

ঐ বেনামাজি -দেরকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নামের ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে? ওরে হতভাগার দল তোরা জাহান্নামে কেন আসলি, জাহান্নামে তো

[110] ইবনে মাজাহ ৪৩০

[111] সূরা কলম আয়াত ৪২

[112] সূরা কলম ৪৩

কোন ভালো মানুষ আসেনা। ما سلككم في سقر তোদের অপরাধ কি? তারা বলবে ﴿قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ﴾ আমাদের অপরাধ হচ্ছে আমরা দুনিয়াতে মুসল্লী ছিলাম না। আমরা হলাম বেনামাজির দল। এই নামাজ না পড়ার কারণে আজ আমাদের এই দুরবস্থা।[113]

দেহ যদি ময়লা ও নাপাক হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি দিয়ে পরিষ্কার করি? সাবান দিয়ে? এবার বলেন আপনার অন্তরটা যদি গোনাহের ময়লা দিয়ে নাপাক ও ময়লা হয়ে যায় তাহলে কোন সাবান দিয়ে পরিষ্কার করবেন? লাইফবয়? লাক্স? কেয়া? না ভাই দুনিয়ার তামাম সাবান যদি গায়ে মেখে শেষ করে ফেলেন তবুও সরিষা দানা পরিমাণ গোনাহও অন্তর থেকে দূর হবে না। এই গোনাহ পরিষ্কার করতে হলে নামাজ নামক সাবান ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرّآت هل يبقى من درنه شيء قال لا يبقى من درنه قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا
তোমাদের কারো বাড়ির দরজার সামনেই যদি একটি নদী থাকে আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সবাই বল্ল না, তার শরীরে কোন প্রলার ময়লা থকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের দৃষ্টান্ত | এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সকল পাপ মুছে নিঃশেষ করে দেন।[114]

শুধু তাই নয়, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের জন্যে অযু করে তাহলে সে অযুর বিনিময়েই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গোনাহ ক্ষমা করতে থাকেন।
إذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خَطِيئَةٍ نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء أو نحو هَذَا وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوب "

113 সূরা মুদ্দাসিসর আয়াত ৩৩-৪৪

114 বুখারী ও মুসলিম

যখন কোন মুমিন অথবা মুসলিম বান্দা অযূ করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে, তার মুখমণ্ডল হতে তার চোখের দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়।

যখন সে তার দুহাত ধৌত করে,তখন তার দুহাত দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে তা ওযুর পানির সাথে অথবা শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়। অতঃপর সে সকল গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়।[115] وعن أبي ذر أن النبي ﷺ خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصن من شجرة قال فجعل আবু যর রাযি: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক শীতের মৌসুমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি একটি গাছের দুটি ডাল ধরে নাড়া দিলেন, ফলে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। হযরত আবু যর রাযি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে সলাতে আদায় করে, তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে।[116]

নামাজের ফজীলত সর্ম্পকে চল্লিশটি হাদিস:

নামাজ বা সালাত সম্পর্কে হাদীসের অন্ত নেই। মহানবী হজরত রাসূলে মকবুল (সা) অসংখ্য নামাজের ফজিলত ও মরতবা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন-তন্মধ্যে মাত্র চল্লিশটি হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলো।

(১) যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র সহি শুদ্ধভাবে রুকু-সেজদার সাথে নামাজ আদায় করলো তার জন্যে বেহেশত ওয়াজিব, দোজখ তার জন্য হারাম হয়ে যায়।

115 মুসলিম ও তিরমিজি

116 আহমদ

(২) আল্লাহর পেয়ারা হাবীব (স) আরো এরশাদ করেছেন, রোজ হাশরে সর্বাগ্রে নামাজের হিসাব নেয়া হবে, মহান রাব্বুল-আলামীন আমার উম্মতের উপর সর্বপ্রথম নামাজ ফরজ করেছেন। নামাজ দ্বীন-ইসলামের খুঁটিস্বরূপ।

(৩) আল্লাহ পাক পরওয়ারদেগার ঐ ব্যক্তিকে দেখ্তে অধিক ভালোবাসেন যে নামাজের মধ্যে সেজদায় কপাল মাটিতে ঠেকায়।

(৪) নামাজ অন্তরের নূরস্বরূপ-যার ইচ্ছা হয় নামাজ দ্বারা অন্তরকে আলোকিত করতে পারে,-

(৫) মানুষ নামাজে দাঁড়ালে তাঁর জন্য বেহেশ্তের দরওয়াজা খুলে যায়।

(৬) আল্লাহ ও নামাজের মধ্যে কোন আড়াল থাকে না।- সেজদা অবস্থায় আল্লাহ পরম করুনাময়ের সান্নিধ্য-নৈকট্য বেশী অর্জিত হয়।

(৭) নামাজের জন্য আল্লাহতায়ালাকে ভয় করো তিনবার বলা হয়েছে। দ্বীন-ধর্মের একমাত্র নিদর্শন নামাজ- যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে নামাজ সম্পন্ন করে সে প্রকৃত মো'মেন।

(৮) দেহের জন্যে যেরূপ মস্তক, দ্বীনের জন্য তেমন নামাজ।

(৯) সেজদায় ব্যবহৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ পাক দোজখের আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

(১০) ওয়াক্তমত শুদ্ধভাবে যে নামাজ আদায় করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

(১১) নামাজ মো'মেন লোকের রূহস্বরূপ।

(১২) মহান আল্লাহ পাক ঈমান ও নামাজের চাইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু ফরজ করেন নাই। যদি করতেন তবে তার ফেরেশতাকুলকে করতে হুকুম করতেন।

(১৩) মানুষ ও শেরেকের মধ্যে নামাজই একমাত্র প্রাচীর।

(১৪) জমীনের যে অংশে নামাজ আদায় করা হয় সেই অংশ অন্য। অন্য অংশের উপর গর্ব করে থাকে।

(১৫) প্রাত:কালে যে নামাজ পড়তে যায় তার ঈমানের ঝান্ডা উড্ডিদ থাকে।

(১৬) আউয়ালওয়াক্ত অর্থাৎ নামাজের সময় হলে প্রথম দিকে নামাজ আদায় আল্লাহ পাকের নিকট অতীব পছন্দনীয়।

(১৭) নামাজ নি:সন্দেহে প্রত্যেক মো'মেন বান্দার কোরবানীস্বরূপ।

(১৮) ওয়াক্তমত (সুনির্দিষ্ট সময়ে) নামাজ আদায় করা সর্ব শ্রেষ্ঠ আমল।

(১৯) মানুষ যখন একান্তচিত্তে নামাজ আদায় করতে থাকে শয়তান তখন তার প্রতিভয় জড়-সড় কম্পমান থাকে।

(২০) সে যখন নামাজের ব্যতিক্রম করে তখন শয়তানের সাহস বৃদ্ধি পায় ও পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে

(২১) দু’রাকাত নামাজ পড়ে দোওয়া করলে নিশ্চিত আলøাহপাক তা কবুল করে নেন।

(২২) যে ব্যক্তি নির্জনে এমনভাবে নামাজ আদায় করলো যে, আলøাহপাক ব্যতীত কেহ জানেনা সে যেন আলহর প্রিয় বান্দা হিসাবে পরিগণিত হলো এবং দোওয়া-ফরিয়াদ কবুলিয়াতের দরজায় পৌঁছে গেল।

(২৩) জোহরের ফরজের পূর্বের চারি রাকাত নামাজ তাহাজ্জুদের চারি রাকাতের সমান।

(২৪) মাঝ রাতের নামাজ শ্রেষ্ঠতম ইবাদত।

(২৫) মানুষ যখন নামাজের জন্য দাঁড়ায় আল্লাহ তাবারক তায়ালার রহমত, করুনা, বরকত, নেয়ামত বর্ষিত হয়।

(২৬) হজরত জিব্রাইল (আ) বলেছেন, হে মোহাম্মদ (স) মোমেন বান্দার শরাফত, বোজগী একমাত্র তাহাজ্জুদ নামজে ইহাতে সন্দেহ নেই।

(২৭) রাত্রের দু’রাকাত নামাজ দুনইয়ার সকল কিছু হতে শ্রেষ্ঠ।

(২৮) তাহাজ্জুদ নামাজ অবশ্যই পড়বে কারণ তাহাজ্জুদ নামাজে রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যলাভ এবং যাবতীয় পাপ পংকিলতা থেকে ক্ষমা পাওয়া যায়।

(২৯) আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের এরশাদ করেছেন, তোমরা দিবসের প্রথম ভাগের চারি রাকাত নামাজ আদায়ে কোন প্রকার কার্পণ্য করিও না। কেননা এই নামাজের বদৌলতে সারা দিনের তোমার যাবতীয় কাজ কর্ম, ইচ্ছা, বাসনা সম্পাদন করে দিব।

(৩০) নামাজ শ্রেষ্ঠ জেহাদ।

(৩১) যখন কোন আসমানী আপদ-বালা-মুসিবত আপতিত:হয় -তখন যারা নামাজ আদায়কারী তাদের উপর থেকে যাবতীয় আপদ-সমস্যা, সংকট থেকে মুক্তিলাভ করবে।

(৩২) অজু করত: নম্র ও বিনয়ের সাথে যে নামাজ আদায় করত: মাগফিরাত কামনা করে, তার সর্ব প্রকার গুণাহ রাশীক্ষমা করে দেয়া হয়।

(৩৩) হজরত রাসুলে পাক (স) বলেছেন, যাবতীয় আমলের মধ্যে নামাজই আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

(৩৪) নামাজ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে- নামাজ রোজা রোজগার বৃদ্ধি করে এমনকি, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ এবং মন-দিলকে শক্তিশালী, বিশেষ করে চেহারা নুরানী হয়ে ওঠে।

(৩৫) নামাজ থেকে যারা গাফেল (দূরে সরে) থাকে এসব মানুষদের কুকুরের সমতুল্য করে দেয়।

(৩৬) এছাড়া আরো বলা হয়েছে-বিনাওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ করলে সে কাফেরের পর্যায়ভুক্ত হবে।

(৩৭) হজরত রাসুলে মকবুল (স) বলেছেন, আস্সালাতু মে'রাজুল মু'মিনীন। অর্থা: নামাজ মু'মিন (বিশ্বাসীদের) জন্য মে'রাজ।

(৩৮) আখেরাতে নাজাত পাবার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে ছালাত বা নামাজ।

(৩৯) আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, যারা সত্যিকার পূত: পবিত্র হয়ে কায়মনে নামাজের মাধ্যমে আহর সমীপে রুকু সেজদা করে তারা সফল কাম হয়েছে।

(৪০) নামাজ সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেছেন, আপনার পরিবার-পরিজনকে নামাজ আদায়ের জন্য নির্দেশ দিতে থাকুন এবং নিজেও যত্নসহকারে নামাজ আদায় করতে থাকুন। আপনার নিকট আমি রিজিক চাই না, রিজিক তো আমিই আপনাকে দান করছি, করবো, সত্যিকারভাবে উত্তম পরিণাম একমাত্র পরহেজগারী।

অতএব আসুন, আমরা নামাজের মাধ্যমেই নিজেদের আত্মা দেহ মন পরিশোধিত করে ফেলি এবং রাব্বুল আলামীনের বাণী অনুযায়ী সত্যিকারভাবে নামাজের মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায়-অপকর্ম ও লজ্জাজনক কাজ-কর্ম থেকে নিজেদের বিরত রাখি।

হাদিসের আলোকে সালাতের ফজিলত:

সালাত প্রসঙ্গে মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থের কিতাবুস সালাত অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিসসমূহ:
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِر» . رَوَاهُ مُسلم

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু'আহ্ হতে অপর জুমু'আহ্ পর্যন্ত এবং এক

রমাযান হতে আরেক রমাযান পর্যন্ত সব গুনাহ্ের কাফফারাহ্ হয়, যদি কাবীরাহ্ (কবিরা) গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়।[117]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীগণের উদ্দেশে) বললেন, আচ্ছা বলো তো, তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার কাছে যদি একটি নদী থাকে, যাতে সে নদীতে দিনে পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, না, কোন ময়লা থাকবে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এ দৃষ্টান্ত হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায়কারীর গুনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।[118]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْل إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذَا؟ قَالَ: «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي

ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমু দিয়েছিল। তারপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বিষয়টি বললো। এ সময়ে আল্লাহ ওয়াহী নাযিল করেনঃ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰت

''সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ক্বায়িম কর দিনের দু' অংশে, রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়ই নেক কাজ পাপ কাজকে দূর করে দেয়[119]

---

[117] মুসলিম

[118] বুখারী ও মুসলিম

[119] সূরাহ্ হূদ ১১: ১১৪

লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা কি আমার জন্য? তিনি বললেন, এটি আমার সকল উম্মতের জন্য। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে তিনি বলেছিলেন, "আমার উম্মাহর মধ্যে যারা এটি মেনে চলে তাদের জন্যও।"

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فأقمه عَلَيّ قَالَ وَلم يسْأَله عَنهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاة قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فأقم فِي كتاب الله قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَو قَالَ حدك

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি ’হাদ্দ’যোগ্য-এর কাজ (অপরাধ) করে ফেলেছি। আমার ওপর তা প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করলেন। লোকটিও রসূলের সাথে সালাত আদায় করলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাত শেষ করলে লোকটি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি হাদ্দ-এর কাজ করেছি। আমার ওপর আল্লাহর কিতাবের নির্দিষ্ট হাদ্দ জারী করুন। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করনি। লোকটি বলল, হ্যাঁ, করেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (এ সালাতের মাধ্যমে) আল্লাহ তোমার গুনাহ বা হাদ্দ মাফ করে দিয়েছেন।[120]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَي الْأَعْمَال أحب إِلَى الله قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ استزدته لزادني

’আবদুল্লাহ (রাঃ)] ইবনু মাস্’ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজ (’আমল) আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সঠিক সময়ে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করা। আমি বললাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি

[120] বুখারী ও মুসলিম

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। রাবী ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে এসব উত্তর দিলেন। আমি যদি আরও জিজ্ঞেস করতাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে আরও কথা বলতেন।[121]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ ترك الصَّلَاة» . رَوَاهُ مُسلم

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (মু'মিন) বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) পরিত্যাগ করা।[122]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لوقتهن وَأتم ركوعهن خشوعهن كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَى مَالك وَالنَّسَائِيّ نَحوه

'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ), যা আল্লাহ তা'আলা (বান্দার জন্য) ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এ সালাতের জন্য ভালোভাবে উযূ (ওযু/ওজু/অজু) করবে, সঠিক সময়ে আদায় করবে এবং এর রুকূ' ও খুশুকে পরিপূর্ণরূপে করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া'দা রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তা না করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া'দা নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।[123]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تدْخلُوا جنَّة ربكُم» . رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ

[121] বুখারী ও মুসলিম

[122] মুসলিম

[123] আহমাদ ও আবূ দাঊদ মালিক এবং নাসায়ী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন

আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের ওপর ফরয করা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় কর, তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা মাসটির সিয়াম (রোযা) পালন কর, আদায় কর তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। তাহলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[124]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِين وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ فِي شرح السّنة عَنهُ

’আমর ইবনু শু’আয়ব (রহঃ) তার পিতার মাধ্যমে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমার সন্তানদের বয়স সাত বছরে পৌঁছবে তখন তাদেরকে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায়ের জন্য নির্দেশ দিবে। আর (সালাত আদায় করার জন্য) তাদের শাস্তি দিবে যখন তারা দশ বছরে পৌঁছবে এবং তাদের ঘুমানোর স্থান পৃথক করে দিবে।[125]

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

বুরায়দাহ্ (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিক্বদের) মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা হলো সালাত। অতএব যে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) পরিত্যাগ করবে, সে (প্রকাশ্যে) কুফরী করলো (অর্থাৎ- কাফির হয়ে যাবে)।[126]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ. فَقَالَ عُمَرَ لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَو سترت نَفْسِكَ. قَالَ وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

124 আহমাদ ও তিরমিযী

125 আবূ দাঊদ

126 তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ وتلا عَلَيْهِ هَذِه الْآيَة (أقِم الصَّلَاة طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات ذَلِك ذكرى لِلذَّاكِرِينَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّة قَالَ: «بل للنَّاس كَافَّة» . رَوَاهُ مُسلم

আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন মাস্‌'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি মদীনার উপকণ্ঠে এক মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর সব রসাস্বাদন করেছি। আমি আপনার দরবারে উপস্থিত, তাই আমার প্রতি এ অপরাধের কারণে যা শাস্তি বিধান করার তা আপনি করুন। 'উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার অপরাধ ঢেকে রেখেছিলেন। তুমি নিজেও তা ঢেকে রাখতে (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে, তবে তা উত্তম হতো)। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাই লোকটি উঠে চলে যেতে লাগলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং তার সামনে এ আয়াত পাঠ করলেন- (অর্থ) ''সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) কায়িম কর দিনের দু' অংশে, রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়ই নেক কাজ বদ কাজকে দূর করে দেয়, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা একটা উপদেশ।[127] এ সময় উপস্থিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর নবী! এ হুকুম কি বিশেষভাবে তার জন্য। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, না, বরং সকল মানুষের জন্যই।[128]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْد الْمُسلم ليصل الصَّلَاة يُرِيد بهَا وَجه الله فتهافت عَنهُ ذنُوبه كَمَا يتهافت هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ . رَوَاهُ أَحْمَد আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক শীতের সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি গাছের দু'টি ডাল ধরে নাড়া

[127] সূরাহ্‌ হূদ ১১: ১১৪

[128] মুসলিম

দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে গাছের পাতা ঝরতে লাগলো। আবূ যার (রাঃ) বলেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করে, তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে।[129]

عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . رَوَاهُ أَحْمَد যায়দ বিন খালিদ আল জুহানী (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দু' রাক্'আত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করেছে, আর এতে ভুল করেনি, আল্লাহ তার অতীত জীবনের সব গুনাহ (সগীরাহ্) ক্ষমা করে দিবেন।[130]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمن لم يحافظ عَلَيْهَا لم يكن لَهُ نور وَلَا برهَان وَلَا نجاة وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَان আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেনঃ যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযাত করবে, তা কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযাত করবে না, তার জন্য এটা জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে না। কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন সে ক্বারূন, ফির্'আওন, হামান ও উবাই বিন খালাফ-এর সাথে থাকবে।[131]

عَن عبد الله بن شَقِيق قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَركه كفر غير الصَّلَاة. رَوَاهُ التِّرْمِذِي

[129] আহমাদ

[130] আহমাদ ও বায়হাক্বী

[131] আহমাদ, দারিমী ও বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান

عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمدا فَمن تَركهَا مُتَعَمدا فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كل شَرّ. رَوَاهُ ابْن مَاجَه আবুদ্‌ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেনঃ (১) তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ডবিখন্ড করা হয় বা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়; (২) ইচ্ছা করে কোন ফরয সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ত্যাগ করবে না, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ত্যাগ করবে তার ওপর থেকে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে; (৩) মদ পান করবে না, কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি।[132]

মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ দোয়া `নামাজ':

নামাজ শুধু আল্লাহ বিধান পালনই নয়; এটা আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়াও বটে। আর এ কারণেই দোয়াকে ইবাদতের মূল বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নামাজ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করে বলেন- তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর; জাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করা।[133]

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আবশ্যক কাজ। ৫ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও বান্দা অনেক নফল নামাজ পড়ে থাকে। নামাজ এমনই এক ইবাদত যা শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য নির্ধারিত। আর এ নামাজ মূলত দোয়া। নামাজের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। যা আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা নামাজ এবং ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা।' অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর; নিশ্চয়

---

132 ইবনু মাজাহ্‌

133 সুরা বাকারা : আয়াত ৪৩

তোমার দোয়া তাদের জন্য শান্তি স্বরূপ।[134] এ আয়াতে সালাত দ্বারা দোয়া করা বুঝানো হয়েছে।

হাদিসে পাকে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন, তোমাদের কাউকে খাবারের দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন উক্ত দাওয়াতে উপস্থিত হয়। অতঃপর সে যদি রোজাদার হয় তবে সে মেজবানের জন্য বরকত, কল্যাণ ও মাগফিরাতের দোয়া করবে। আর যদি সে রোজাদার না হয় তবে সে যেন খাবার গ্রহণ করে।[135]

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদিসে বরকত, কল্যাণ ও মাগফেরাত বুঝাতেও সালাত শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বুঝা যায় যে, নামাজ হচ্ছে বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা প্রিয়নবির প্রতি অনুগ্রহ নাজিলের ক্ষেত্রেও বলেছেন 'সাল্লু' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ সালাতকেই আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য দৈনিক ৫ সময় ফরক করে দিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে কারো ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সালাত মানে হলো ফেরেশতাদের কাছে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা; আবার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে কারো প্রতি সালাতের মানে হলো মহান আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য দোয়া করা। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সুরা আহজাবের ৫৬নং আয়াতে বলেছেন- 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের কাছে নবির প্রশংসা করেন; এবং ফেরেশতারাও নবির জন্য দোয়া করেন। অতএব হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর প্রতি দোয়া এবং সালাম পেশ কর।'

---

[134] সুরা তাওবা : আয়াত ১০৩

[135] মুসলিম

সর্বোপরি ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নামাজ হলো এমন এক ইবাদত, যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও তাঁর সাওয়াবের আশায় আদায় করা হয়। এ নামাজে রয়েছে এমন কিছু বিশেষ কথা ও কাজ যার শুরু 'আল্লাহু আকবার' তাকবির দিয়ে আর শেষ হয় সালাম ফিরানোর মাধ্যমে।

বান্দার জন্য নাজাত লাভের একমাত্র মাধ্যম ঈমান গ্রহণের পর যথা সময়ে নামাজ আদায় করা। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে নাজাত লাভে সব ধরনের দোয়া চাওয়া।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে তাঁর বিধান পালনে নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়ার তাওফিক দান করুন। যথা সময়ে জামাআতের সঙ্গে ফরজ নামাজগুলো আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সালাত গোনাহ মার্জনার অন্যতম উপায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا

"যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে, যেখানে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তার দেহে কি ধুলি ময়লা কিছু অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবীগণ বলেন: না। তার ধুলিময়লা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও অনুরূপ। এগুলির মাধ্যমে আল্লাহ পাপরাশি ক্ষমা করেন।[136]

নামায বা সালাত হলো মুমিন ও কাফিরের মধ্যে মাপকাঠি। সালাত ত্যাগ করলে মানুষ কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। অন্য হাদীসে তিনি বলেন: مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ فَقَدْ كَفَر

[136] মুসলিম ৫/৫১, হাঃ ৬৬৭

“যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে কাফির হয়ে গেল।[137] কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে একথা নিশ্চিত যে, নামায মূসলিমের মূল পরিচয়। নামায ছাড়া মুসলিমের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। নামায পরিত্যাগকারী কখনোই মুসলিম বলে গণ্য হতে পারেন না।

সালাত কাযা করাকে “কুফরী” গোনাহ বলে উল্লে-খ করা হয়েছে হাদীসে। এজন্য এক ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করা দিনরাত শূকরের গোশত ভক্ষণ করা, মদপান করা, রক্তপান করা ইত্যাদি সকল ভয়ঙ্কর গোনাহের চেয়েও বেশী গোনাহ। যে ব্যক্তি মনে করেন যে, নামায না পড়লেও ভাল মুসলমান থাকা যায় সে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে কাফির; কারণ তিনি নামাযের ফরযিয়্যত মানেন না।

আর যিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন যে, নামায কাযা করলে কঠিনতম গোনাহ হয়, এরপরও ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নামায পরিত্যাগ করেন তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা যাবে কিনা সে বিষয়ে ফকীহদের মতভেদ আছে। সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে এই প্রকারের মানুষকেও কাফির বা অমুসলিম বলে গণ্য করা হত। সহীহ হাদীসে তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক বলেন- كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সাহাবীগণ সালাত ছাড়া অন্য কোনো কর্ম ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।

চার ইমামের মধ্যে ইমাম আহমদ এ মত পোষণ করেন। এ মতে মুসলিম কোন পাপকে পাপ জেনে পাপে লিপ্ত হলে কাফির বলে গণ্য হবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম নামায ত্যাগ করা। যদি কেউ নামায ত্যাগ করাকে কঠিনতম পাপ জেনেও এক ওয়াক্ত ফরয নামায ইচ্ছা পূর্বক ত্যাগ করে তবে সে মুরতাদ বলে গণ্য হবেন। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী প্রমুখ ইমাম বলেন যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সরাসরি কাফির বলা যাবে না, তবে তাকে নামায ত্যাগ্যের শাস্তি স্বরূপ জেল ও মৃত্যুদন্ড প্রদান করতে হবে।

---

[137] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৮৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীঃ আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলো নামাযের। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফরি করল।[138]

ফরয সালাত কাযা করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: لاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّداً فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ - ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِه “ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাতও পরিত্যাগ করবে না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাত পরিত্যাগ করবে, সে আল্লাহর যিম্মা ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিম্মা থেকে বহিস্কৃত হবে।

এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? নাম কাটা যাওয়ার পরে তো আর উম্মাত হিসেবে কোনো দাবিই থাকে না। ক্ষমা বা শাফাআত লাভের আশাও থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّف

“কেয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম তার সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সালাত টিকলে তার অন্য সকল আমল টিকে যাবে। আর সালাতই যদি নষ্ট হয় তবে সে নিরাশ ও ধ্বংসগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয থেকে কিছু কম পড়ে তবে আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোনো নফল আছে কিনা, তখন তার নফল সালাত দিয়ে ফরযে ত্রুটিবিচ্যুতি পূরণ করা হবে। অতপর তার সকল আমল এরূপ হবে।[139]

[138] জামে তিরমিযী, ২৬২১

[139] মাযমাউল যাওয়ায়েদ ১/২৯২৩

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত অবশ্যই মসজিদে যেয়ে জামাতে আদায় করতে হবে। হানাফী মাযহাবে পুরুষের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত জামাতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। হানাফী মাযহাবের প্রাচীন গ্রন্থে জামাতে নামাযকে ওয়াজিবই লিখা হয়েছে। পরবর্তী কোনো কোনো গ্রন্থে সুন্নাত লিখা হলেও সেখানে উল্লে-খ করা হয়েছে যে, তা ওয়াজিবের পর্যায়ের। অন্যান্য মাযহাবে জামাতে নামায ফরয হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর সকল ইমাম ও ফকীহ একমত যে, ওযর ছাড়া যদি কেউ জামাতে সালাত আদায় না করে একাকি সালাত আদায় করেন তবে তিনি গোনাহগার হবেন।

তবে তার সালাত জায়েয হবে কিনা বা আদায় হবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে জামাতে সালাত আদায় করা অত্যন্ত বড় নেক কর্ম। পক্ষান্তরে জামাত পরিত্যাগ করে একাকি সালাত আদায় করা অত্যন্ত কঠিন কবীরা গোনাহ। যে গোনাহের জন্য স্বয়ং রাসূলুল্ল-াহ ৎ বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণ কখনোই কঠিন ওযর ছাড়া জামা'আত ত্যাগ করেননি। জামা'আতে অনুপস্থিত থাকাকে তাঁরা নিশ্চিত মুনাফিকের পরিচয় বলে জানতেন। ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন,
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ যার পছন্দ হয় যে, সে আগামীকাল মুসলিম হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সে যেন এ সকল সালাতগুলি সদাসর্বদা নিয়মিত সেখানে আদায় করে যেখানে এগুলির জন্য আযান দেওয়া হয়। কারণ আল্লাহ তোমাদের নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্য কিছু হেদায়েতের সুন্নাতের (রীতির) বিধান প্রদান করেছেন। আর এ সকল সালাতগুলি নিয়মিত জামাতে আদায় করা হেদায়েতের সুন্নাতের অন্যতম। যদি তোমরা তোমাদের বাড়িতে সালাত আদায় কর, যেরূপ এই পশ্চাতপদ ব্যক্তি নিজ বাড়িতে সালাত আদায়

করে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাত পরিত্যাগ করবে।

আর যদি তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত পরিত্যাগ কর তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। যখনই কোনো ব্যক্তি সুন্দর রূপে ওযু বা গোসল করে পবিত্র হয় এবং এরপর সে এ সকল মসজিদের যে কোনো একটি মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে তখন আল্লাহ তার ফেলা প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার জন্য একটি পুণ্য লিখেন, তাকে একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি পাপ ক্ষমা করে দেন। আমরা আমাদেরকে দেখেছি যে, শুধুমাত্র যে মুনাফিকের মুনাফিকী সুপরিচিত সে ছাড়া কেউই জামা'আত থেকে পিছে পড়ত না। অনেক মানুষকে দুই ব্যক্তির কাঁধের উপর ভর করে টেনে এনে সালাতের কাতারে দাঁড় করানো হতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ (فَلَمْ يُجِبْ) فَلا صَلاةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ "যে ব্যক্তি নামাযের আহ্বান (আযান) শুনতে পেল কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামাতে এলো না, তার নামাযই হবে না। তবে যদি ওযর (ভয় বা অসুস্থতা) থাকে তাহলে হতে পারে।"

জামাতে নামায ত্যাগ করা যেমন ভয়ঙ্কর অপরাধ ও গোনাহের কাজ, তেমনি জামাতে নামায আদায় অপরিমেয় সাওয়াব ও বরকতের কাজ। ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً একাকী সালাতের চেয়ে জামা'আতে সালাতের মর্যাদা ২৭ গুণ বেশি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে সে আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। ইশার সালাত জামাতে আদায় করলে অর্ধেক রাত তাহাজ্জুদের সাওয়াব হবে। আর ফজরের সালাত জামাতে আদায় করলে

পুরো রাত তাহাজ্জুদের সাওয়াব হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য চল্লিশ দিন প্রথম তাকবীরসহ পরিপূর্ণ নামায জামাতে আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ দুইটি মুক্তি লিখে দিবেন: জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও মুনাফিকী থেকে মুক্তি।"

ফরয সালাত যেমন শ্রেষ্ঠতম ইবাদত, তেমনি নফল সালাতও সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম উপায়। আমরা অনেক সময় 'নফল' নামাযে অবহেলা করি। নফলের গুরুত্বও প্রদান করতে চাই না। ফরয বাদ দিয়ে শুধু নফল ইবাদত করা বকধার্মিকতা। আবার নফল বাদ দিয়ে শুধু ফরয ইবাদত পালন করাও দীন সম্পর্কে বড় অবহেলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনে আমরা দেখতে পাই সকল প্রকার নফল ইবাদতের প্রতি সীমাহীন গুরুত্ব ও আগ্রহ।

নফল সালাত, নফল সিয়াম, নফল তিলাওয়াত, নফল যিকর, নফল দান ইত্যাদির জন্য তাঁরা ছিলেন সদা উদগ্রীব ও ব্যস্ত। অনেকে বলেন, অমুক ব্যক্তি এত নফল ইবাদত করে, কিন্তু ফরয পালন করছে না, কাজেই নফল করে কি হবে? এ ধরণের কথা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। কেউ যদি ইচ্ছাপূর্বক ফরয বাদ দিয়ে শুধু নফল নিয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধী। কিন্তু তার অপরাধের জন্য কি আমরা উল্টা আরেকটি অপরাধ করব? এছাড়া কেউ যদি ফরয ও নফল ইবাদত পালনের চেষ্ট করে কিন্তু ফরযের মধ্যে কিছু ক্রটি বিচ্যুতি হয় তাহলে নফল দিয়ে তা আল্লাহ পূরণ করবেন।

সর্বোপরি ফরয ইবাদত পালনের সাথে সাথে সর্বদা নফল ইবাদত পালন করাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাত। এছাড়া আল্লাহর

কাছে অধিকতর নৈকট্য, পুরস্কার, মর্যাদা ও সম্মান অর্জনের মাধ্যমই হলো ফরযের পাশাপাশি নফল ইবাদত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

"আমার নৈকট্যের জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয পালনই আমার নৈকট্যে অর্জনের জন্য সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি।[140]

নফল ইবাদতগুলির মধ্যে নফল সালাত অন্যতম। এ বিষয়ে সাহাবীগণের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। এক সাহাবী প্রশ্ন করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

"তুমি আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সাজদা করবে (বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবে); কারণ তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সাজদা কর, তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করেন।"

রাবীয়া ইবনু কা'ব নামক এক যুবক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আবেদন করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এক জান্নাতে থাকতে চান বা জান্নাতে তাঁর সাহচর্য চান। তিনি বলেন: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود "তাহলে বেশি বেশি সাজদা করে (নফল সালাত আদায় করে) তুমি আমাকে তোমার বিষয়ে সাহায্য কর।"

140 সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৬৫০২

সাধারণভাবে নফল সালাত ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিশেষ সালাতের বিশেষ মর্যাদা বা ফযীলতের কথাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হলো রাতে তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল্লাইল এবং সূর্যোদয়ের পরে দ্বিপ্রহরের আগে যোহা বা চাশতের নামায। ইসলামের অন্যতম নফল ইবাদত কিয়ামুল্লাইল। প্রথম রাতে বা শেষ রাতে, ঘুমানোর আগে বা ঘুম থেকে উঠে অন্তত কিছু নফল সালাত আদায় করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

একটু ঘুমিয়ে উঠে 'তাহাজ্জুদ'-রূপে আদায় করলে তার দসাওয়াব ও মর্যাদা বেশি। কুরআনে বারংবার কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অগণিত হাদীসে এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, রাতের একাকী মুহূর্তে কিছু সময় সালাত, আল্লাহর যিকর, তার সাথে মুনাজাত এবং তাঁরই (আল্লাহর) ইবাদতে ব্যয় করা মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আয়েশা (রা) বলেন:

لا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ لا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا

"কখনো রাতের কিয়াম (তাহাজ্জুদ) ত্যাগ করবে না; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো তাহাজ্জুদ ত্যাগ করতেন না। যদি অসুস্থ থাকতেন অথবা ক্লান্তি বোধ করতেন তবে তিনি বসে তা আদায় করতেন।"

চাশতের বা সালাতুয যোহার বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (وفي رواية: سُبْحَةَ الضُّحَى) كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ... تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّة

"যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে বসে বসে আল্লাহর যিকির করবে সূর্যোদয় পর্যন্ত, এরপর দু রাক'আত যোহা বা চাশতের নামায আদায় করবে, সে একটি

হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে: পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে।)

এছাড়া ওযুর পরেই দু রাকআত তাহিয়্যাতুল ওযূ, মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে অন্তত দু রাক'আত দুখুলুল মাসজিদ বা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত নিয়মিত আদায় করার বিশেষ নির্দেশ ও ফযীলত বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক প্রদান করুন। আমীন।

জামা'আতে সালাত আদায় করার গুরুত্ব:

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামা'আতে আদায় করা সকল সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) পুরুষের জন্য ওয়াজিব। ইমাম আহমদ রহ. তার কিতাবুস সালাতে একটি ঘটনাটি বর্ণনা করেন। যার মূল বর্ণনা রয়েছে সহীহ মুসলিমে। ইমাম আহমাদ বলেন, "আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে; সে বলল হে আল্লাহর রাসূল, আমি একজন দৃষ্টি শক্তিহীন, দুর্বল শরীর এবং বৃদ্ধ মানুষ, বাড়ীও দূরে, মসজিদ ও আমার মাঝে খেজুর গাছ এবং খালও রয়েছে। অতএব, আমি বাড়ীতেই সালাত আদায় করব এই অনুমতি কি রয়েছে?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: "তুমি কি আযান শুন?" সে বলল জি হ্যাঁ, তিনি বললেন: "তবে মসজিদে আসতে হবে।"

ইমাম আহমদ উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা শেষে বলেন, "যদি কারো জন্য সালাতের জামা'আত থেকে বিরত থাকার সুযোগ থাকতো তবে অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বৃদ্ধ, দুর্বল শরীর, দৃষ্টি শক্তিহীন, বাড়ী দূরে অবস্থিত এবং তার ও মসজিদের মাঝে অনেক খেজুর গাছ ও খাল বিদ্যমান ব্যক্তিটিকে অনুমতি দিতেন।[141]

[141] ইমাম আহমদের উক্তি এ পর্যন্ত

এই স্পষ্ট সহীহ্ হাদীস থেকে বোঝা যায় কারো জন্য সালাতের জামা'আত থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এ ব্যক্তির ওযর গ্রহণও করতেন তবুও কোনো সুস্থ-সবল ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য জামা'আত থেকে বিরত থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য হতো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তার ওযর প্রত্যাখ্যান করে তাকে মসজিদের জামাতে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিলেন, আর তাঁর নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

মসজিদে জামা'আতবদ্ধভাবে সালাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় দলীল হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ "যে ব্যক্তি আযান শুনল অতঃপর শর'ঈ ওযর ব্যতীত মসজিদে উপস্থিত হলো না তার সালাত হবে না।[142]
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, শর'ঈ ওযর কী? তিনি বলেন, ভয়-ভীতি অথবা অসুস্থতা। বিনা ওজরে মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায আদায়কারীর প্রতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের কঠোর সতর্কবার্তা- শপথ ঐ সত্তার যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আমি ইচ্ছা পোষণ করছি যে, কাঠ (জ্বালানী) একত্রিত করার আদেশ দিব এবং এক ব্যক্তিকে আদেশ দিব সে যেন সালাতের ইমামতী করে অতঃপর (যে মসজিদে আসেনি) আমি ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের নিকট গিয়ে তাদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেই।[143]

ইমাম আহমদ "কিতাবুস সালাত"-এ বলেন, তাদের সালাত থেকে বিরত থাকা যদি বড় গুনাহ্ না হতো, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুশিয়ারী দিতেন না। সালাতের জামা'আত থেকে মুনাফিক ব্যক্তিই বিরত থাকত, যাদের মুনাফেকী স্পষ্ট।

---

[142] আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ

[143] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি চায় যে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে মুসলিম অবস্থায় সাক্ষাৎ করে আনন্দ উপভোগ করবে, সে যেন সালাতসমূহের হিফাযত করে যেখানেই সালাতের আযান দেওয়া হোক না কেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর জন্য হিদায়াতের বিধিসম্মত পথ নির্ণয় করেছেন। আর সালাতসমূহ ঐ বিধিসম্মত পথেরই অন্তর্ভুক্ত, তোমরা যদি নিজেদের ঘরে-ঘরে সালাত পড়া শুরু কর যেমন, (জামা'আত থেকে) বিরত এ ব্যক্তিটি নিজের ঘরে সালাত আদায় করে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করলে, আর যদি তোমাদের নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ কর তবে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। আর আমরা তো আমাদের যুগে দেখতাম, সালাতের জামা'আত থেকে মুনাফিক ব্যক্তিই বিরত থাকত, যাদের মুনাফেকী স্পষ্ট। (আমাদের মাঝে এমন) এক ব্যক্তিও ছিল যাকে দু'জনের উপর ভর করে নিয়ে এসে (সালাতের) কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত।[144]

নামাজের উপকারিতা:

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম হচ্ছে- নামাজ। ঈমানের পরেই নামাজের মর্যাদাগত অবস্থান। রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, 'বলুন! আমার বান্দাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে তারা যেন নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি যা তাদেরকে দান করেছি তা হতে ব্যয় করে।'

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় রুকু, সিজদাসহ নির্দিষ্ট আহকাম সম্বলিত এমন বিশেষ ইবাদত অনুষ্ঠানকে নামাজ বলা হয়- যার মাধ্যমে বান্দা ও স্রষ্টার মাঝে সুনিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক নর-নারী মুসলিমের ওপর আদায় করা ফরজ। নামাজ ফরজ ইবাদত হলেও নামাজ আদায়ের মূল

144 সহীহ মুসলিম

উপকারিতা হচ্ছে, অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মানুষকে বিরত রাখা। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘নিশ্চয় নামাজ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।’

এ প্রসঙ্গে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যদি কোনো ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও প্রতিটি জুমার নামাজ রীতিনীতিসহ আদায় করে এবং প্রতি বছর রমজানের রোজাগুলো যথাযথভাবে পালন করে, তাকে আল্লাহতায়ালা এক নামাজ হতে অপর নামাজ, এক জুমা হতে অপর জুমা এবং এক রমজান হতে অপর রমজানের মধ্যকার সময়ে সংঘটিত যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করে দেন।[145] তবে শর্ত হলো, তাকে কবিরা গোনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।’ কেননা আল্লাহতায়ালা বলেছেন,

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا

‘তোমরা যদি নিষেধাজ্ঞাসমূহের পাশাপাশি কবিরা গোনাহ থেকে বিরত থাকো, তবে আমি তোমাদের সগিরা গোনাহগুলো মিটিয়ে দেব।[146] সুতরাং সগিরা গোনাহ থেকে ক্ষমালাভের জন্য আমাদের উচিত কবিরা গোনাহ থেকে বিরত থেকে যথাযথভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমা ও রমজানের রোজাগুলো পালন করা। আল্লাহতায়ালার হুকুম পালনের পাশাপাশি নামাজের মাধ্যমে অনেক বৈষয়িক উপকারিতা ও অর্জিত হয়। যেমন-

মুসলিম ঐক্য : নামাজ মুসলিম ঐক্যের এক শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচ বার নামাজের উদ্দেশ্য মসজিদে একত্রিত হয়ে ঐক্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

আনুগত্যের শিক্ষা : নামাজে ইমামের অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে নেতার আনুগত্যে শিক্ষা লাভ হয়।

---

145 সহিহ মুসলিম- ২৩৩

146 সূরাঃ আন-নিসা- আয়াত নং- ৩১

চরিত্র গঠন : নামাজ চরিত্র গঠনের উত্তম উপায়। দৈনিক পাঁচ বার তাওহিদ, রেসালাত ও আখেরাতকে স্মরণের মাধ্যমে চরিত্রের মন্দ দিকগুলো দূরীভূত হয়।

নেতৃত্বের দায়িত্ববোধ : নামাজ দ্বারা নেতৃত্বের দায়িত্ববোধের শিক্ষা অর্জিত হয়। এমনকি সমাজ ও জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার শিক্ষা এখান থেকে অর্জিত হয়।

পারস্পরিক সহযোগিতা : সমাজে মসজিদ তৈরি ও এর রক্ষণাবেক্ষণকারী ইত্যাদি কার্যাবলী মাধ্যমে মানুষ মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সামাজিক গুণ সৃষ্টি হয়।

পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি : মুসলমানগণ প্রত্যহ পাঁচ বার নামাজ কায়েমের লক্ষ্যে মসজিদে সমবেত হওয়ায় তাদের মাঝে সামাজিক সম্প্রীতি, একতার বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে।

শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ : মুসলমানরা নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে প্রত্যেহ পাঁচ বার নির্ধারিত সময়ে মসজিদে সমবেত হয় এবং কাতারবন্দি হয়ে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে নামাজ আদায় করে। এতে মানুষ নিয়ম শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ লাভ করে।

নামাজ পরিত্যাগের পরিণাম : ইচ্ছেকৃতভাবে নামাজ পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে হজরত রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এ ছাড়া বেনামাজির জন্য ১৪ প্রকার শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।[147] হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি নামাজের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করে। আল্লাহতায়ালা তাকে চৌদ্দ প্রকার শাস্তি প্রদান করেন।

দুনিয়ায় পাঁচ শাস্তি

১. তার জীবন ও জীবিকার বরকত কেড়ে নেওয়া হবে।

২. তার চেহারা হতে নেককার লোকদের নূর মুছে ফেলা হবে।

৩. সে যেকোনো নেক আমল করুক, আল্লাহ তাতে কোনো সওয়াব দান করেন না।

৪. তার কোনো দোয়াই কবুল করা হয় না।

৫. নেককারদের দোয়ায় তার কোনো অংশ থাকে না।

মৃত্যুকালীন তিন শাস্তি

[147] https://www.news24bd.tv/details/149319

১. অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

২. ক্ষুধার্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে।

৩. চরম তৃষ্ণার্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। যদি সমস্ত পৃথিবীর সাগরের পানিও তাকে পান করানো হয়, তবুও তার তৃষ্ণা কমবে না।

কবরের তিন শাস্তি:

১. তার কবর এত সংকীর্ণ করা হবে যে, তার এক পাঁজরের হাড় অন্য পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যাবে।

২. তার কবরে আগুন জ্বালানো হয়, সে আগুনের শিখার ওপর দিনরাত উলট-পালট অবস্থায় দগ্ধ হতে থাকবে।

৩. তার কবরে একটি ভয়ংকর বিষধর অজগর নিয়োগ করা হবে। যার চোখ দু'টি আগুনের এবং নখরগুলো লোহার মতো শক্ত কিছু দ্বারা তৈরি হবে। অজগরটি বজ্রের ন্যায় আওয়াজ দেবে এবং মৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টা রাতদিন কেয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে।

কেয়ামতের তিন শাস্তি:

১. অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে বেনামাজির হিসাব নেওয়া হবে।

২. তাকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দেওয়া হবে।

৩. অত্যন্ত অপমানের সঙ্গে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কেয়ামতের দিন বেনামাজি কপালে তিনটি লাইন লেখা অবস্থায় উঠবে। 'হে আল্লাহর হক বিনষ্টকারী।' 'হে আল্লাহর গজবের পাত্র! দুনিয়াতে তুমি যেভাবে আল্লাহর হক নষ্ট করেছো, সেরূপ আজ তুমি আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত।' অতএব জ্ঞান থাকা অবস্থায় কোনো মুমিন-মুসলমানের জন্য কোনো অবস্থায় নামাজ পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।

নামাজের জাগতিক উপকারিতা:

একজন মুমিনের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল বা ইবাদত হচ্ছে নামাজ। নামাজ ধর্মের খুঁটি। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নামাজ ধর্মের খুঁটি। যে ব্যক্তি নামাজ ঠিক রাখল, সে ধর্মকে ঠিক রাখল। আর যে খুঁটিকে বিনষ্ট করল, সে ধর্মকে বিনষ্ট করে ফেলল।[148]

আল্লাহতায়ালা মুসলমানের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুসলিমরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে থাকে। নামাজ পড়ার নিয়ম-কানুন যেন ব্যক্তির সুস্থ-সবল থাকার জন্য উপযুক্ত ব্যায়াম। কোনো ব্যক্তি তার শরীরকে সুস্থ-সবল রাখতে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ব্যায়াম করে, তার সবই যেন প্রতিফলিত হয় নামাজ পড়ার সময় ব্যক্তির অঙ্গপ্রতঙ্গের বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে।

নামাজ পড়ার আগে মুসলমানরা ওজু করার মাধ্যমে শরীরকে পবিত্র করে নামাজের জন্য প্রস্তুত হয়। ওজুর মাধ্যমে ব্যক্তি তার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো পরিষ্কার করে নেয় এবং জীবাণু থেকে এভাবে রক্ষা পায়। ওজু করার সময় মুখে ম্যাসেস করার ফলে মুখের রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। নামাজে দাঁড়ানোর সময় একজন ব্যক্তি সোজা হয়ে দাঁড়ায় নামাজের নিয়মানুযায়ী, ফলে মেরুদণ্ড স্বাভাবিক থাকে।[149]

তাকবির তাহরিমায় হাত উঠানো, হাত নামানো হয়, ফলে বাহুদ্বয়ের ব্যায়াম হয়। হাত বাঁধার ফলে কনুইয়ের আশপাশের পেশির ও বগলের পেশির ব্যায়াম হয়। হাত বাঁধার সময় এক হাতের সঙ্গে আরেক হাতের আঁকড়ে ধরার কারণে হাতের তালু, আঙুল ও কবজির ব্যায়াম হয়। ব্যক্তি নামাজরত অবস্থায় রুকুতে গেলে তার পিঠ সমান্তরাল থাকে, ফলে পিঠ ও ঘাড়ের পেশি সম্প্রসারিত হয়।

---

[148] শুআবুল ইমান– ২৮০৭

[149] https://www.jugantor.com/tp-islam-and-life/607647

নামাজে যথাযথভাবে এ রুকু করার ফলে ব্যক্তির পিঠ ব্যথা দূর হয়। নামাজরত অবস্থায় ব্যক্তি যখন সেজদায় যায়, তার মাথা জমিনে রাখে, ফলে শরীরের সব হাড়ের জোড়া নমনীয় হয় মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিকভাবে ঘটে ও উচ্চরক্তচাপ কমার সম্ভাবনা থাকে। সেজদা অবস্থায় ব্যক্তির হাত, পিঠ ও কোমরের ব্যায়াম হয়। পেট ও পেটের নিচের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া হয় ও রক্ত চলাচল বেড়ে যায়, ফলে অনেক রোগের উপকার হয়। যেমন-কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজম ইত্যাদি।

নামাজে বসারত অবস্থায় হাঁটু ও পায়ের গোড়ালির ওপর চাপ পড়ে, ফলে এক ধরনের ব্যায়াম হয়। নামাজে বসা অবস্থায় ডানে ও বামে সালাম ফেরানোর মাধ্যমে ব্যক্তি নামাজ শেষ করে, ফলে ব্যক্তির ঘাড়ের ব্যায়াম হয়। অর্থাৎ দেখা যায়, নামাজ পড়ার মাধ্যমে ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়াম হয়, যা ব্যক্তিকে সুস্থ রাখতে সহায়ক। ব্যক্তি নামাজ পড়ার মাধ্যমে শুধু শারীরিক নয় বরং মানসিক প্রশান্তিও ফিরে পায়। কারণ নামাজ এমন এক ইবাদত, যার মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে।

ব্যক্তি এ ইবাদতের মাধ্যমে তার সব কষ্ট, দুঃখ, আকাক্সক্ষা, চাওয়া-পাওয়া সব তার মালিকের কাছে বলতে পারে, যা ব্যক্তিকে এক প্রকার মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। নামাজের সময় ব্যক্তির মন পবিত্র থাকে, শান্ত থাকে ফলে ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর কার্যক্ষমতা বেড়ে যায়, ব্যক্তির জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়, যা ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার বহিঃপ্রকাশ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে ব্যক্তি অবহিত থাকার কারণে সময়ানুবর্তী হয়ে ওঠে। ব্যক্তির জীবনে শৃঙ্খলা ফিরে আসে ও ব্যক্তি অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতে পারে। জীবনের সব হতাশা, অশান্তি, বিষণ্নতা, অস্থিরতার নিগঢ় থেকে বেরিয়ে মানসিক শান্তি লাভ করে।

এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় একজন মুসলিম ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রশান্তি এনে দিতে পারে। তাই এ নামাজকে উম্মতে মুহাম্মাদির ওপর প্রথম ফরজ করা হয়েছে। আর নামাজের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। আল্লাহর সঙ্গে বান্দার গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে নামাজের মাধ্যমে। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, 'সিজদা কর এবং নিকটবর্তী হও।' রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'বান্দা সিজদারত অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।[150]

ওই হাদিসের সিজদা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাজ। অর্থাৎ যার যত বেশি নামাজ হবে, সে তত বেশি আল্লাহর নিকটবর্তী হবে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে। এ নামাজ এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যান্য সব ইবাদত, হুকুম, বিধিবিধান আল্লাহতায়ালা হজরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে ওহি আকারে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন; কিন্তু নামাজই একমাত্র বিধান, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া হিসাবে দান করেছেন।

সালাতের পূর্ব প্রস্তুতি- পবিত্রতা অর্জন

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। হোক তা আত্মার, শারিরীক কিংবা পরিবেশের। মানুষের উপর আল্লাহর এই নিয়ামত তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন মানুষ সঠিক পন্থায় আত্মা ও শরীর উভয়ের তাহারাত বা পাক-পবিত্রতা অর্জনের পাশাপাশি পরিবেশেরও জন্য পূর্ণ জ্ঞান ও হেদায়েত লাভ করতে সক্ষম হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- আততুহুরু শাতরুল ঈমান। **অর্থ :** পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[151]

---

[150] মুসলিম– ৪৮৬

[151] সহীহ মুসলিম

কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবো :

আমরা ৩ ভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে পারি-

ক. অযুর মাধ্যমে;

খ. গোসলের মাধ্যমে ও

গ. তায়াম্মুমের মাধ্যমে

মানুষ সাধারণত ইবাদত-বন্দেগী তথা নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি করার জন্য সব সময় অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে থাকে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۶﴾[152]

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাজ পড়ার ইচ্ছা করো, তখন তোমাদের সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করো (কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, পুরুষদের দাড়ি খিলাল করা এর অর্ন্তভূক্ত); উভয়হাত কনুইসহ ধৌত করা (দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিন বার করে ধৌত করা অর্ন্তভূক্ত); মাথা মাসেহ করা (কান ও ঘাড় মাসেহ এর অর্ন্তভূক্ত); উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা। এই চারটি হচ্ছে অযুর ফরজ।[153]

জেনে রাখা ভালো, পায়খানা-পেশাবের পর, বমি করার পর, রক্ত-পুজ বের হলে, ঘুমালে, বেহুশ হলে, নামাজে অট্ট হাসি দিলে অযু নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এর কোনটি ঘটলে আমরা উপরোক্ত নিয়ে অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করবো।

[152] সূরা মায়েদা : আয়াত ৬

[153] সূরা মায়েদা : আয়াত ৬

গোসলের মাধ্যমে পাক-পবিত্রতা :

স্ত্রী সহবাস ও স্বপ্ন দোষের কারণে মানুষের উপর গোসল করা অত্যাবশক হয়ে যায়। যতক্ষণ না মানুষ গোসল না করে, শুধু অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্থ থাক, তখন তোমরা নামাজের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও, যা কিছু তোমরা বলছ আর (নামাজের কাছে যেও না) গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায়; যতক্ষণ না তোমরা গোসল করে নাও; কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাকো কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা ক্ষমাশীল।[154]

অতএব আল্লাহর বিধান হচ্ছে- গোসল ফরজ হলে তা গোসলের মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। গোসলের নিয়ম-

ক. কুলি করা;

খ. নাকের নসারন্ধ্রের/নাসিকামূলে পানি টেনে নেয়া;

গ. সমস্ত্র শরীর ভালভাবে ধৌত করা এবং

ঘ. গোসল সমাপ্তির পর গোসলের স্থান থেকে সরে যেয়ে পা ধৌত করা বা গোসলের জায়গা পরিস্কার করে পা ধৌত করা।

[154] সূরা নিসা : আয়াত ৪৩

সতর্কতা-

গোসলের পূর্বে, যে স্থানে বা কাপড়ে নাজাসাত বা অপবিত্রতা লেগে থাকে তা আগে ভালভাবে ধুয়ে নেয়া। তারপর উপরোল্লিখিত নিয়মে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা।

পানি পাওয়া না গেলে-

১. মুসাফির অবস্থায় ঘুমে অথবা কোনো কারণে গোসল ফরজ হয়ে যায় এবং পানি পাওয়া না যায় সে ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করে নিতে হবে। অত্র আয়াতেই বলা হয়েছে যে, তায়াম্মু করেই পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব।

২. মসজিদে থাকা অবস্থায় যদি এই সমস্যা হয় এবং গোসলের ব্যবস্থা না থাকে তবে অযুর ব্যবস্থা থাকে তবে অযু করে মসজিদে অবস্থানের ব্যাপারে মতামত পাওয়া যায়।

তায়াম্মুম কী?

তায়াম্মুম শব্দের অর্থ হচ্ছে- ইচ্ছা করা, সংকল্প করা অর্থাৎ পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ইচ্ছা বা সংকল্প করা। তায়াম্মুম শুধু গোসল ফরজ হলেই নয় বরং অযুর বেলাতেও তায়াম্মুক করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়-

১. যদি পানি পাওয়া না যায়;

২. পানি পাওয়া গেলেও যদি পানি ব্যবহার করলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে;

৩. ঐ বাচ্চা যার ঠাণ্ডা লেগে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, যদি মা ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করে; এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে।

তায়াম্মুম করার নিয়ম-

তায়াম্মুম করার বিষয়টি অত্র আয়াতে বলা হয়েছে-

ক. সমস্ত্র মুখমণ্ডল মাসেহ করবে;

খ. উভয় হাত কুনুইসহ মাসেহ করবে;

এখন কেউ কেউ বলেছেন- পাক-পবিত্র মাটির উপর উভয় কাজ করার পূর্বে মাটিতে দু'হাত ঘসে নিতে হবে; আবার কেউ কেউ বলেছেন- একবার ঘষলেই চলবে; আমরা উভয় কাজের পূর্বেই আলাদা আলাদা ভাবে পবিত্র মাটি দ্বারা হাত ঘষে তায়াম্মুম করে থাকি। এটি আহনাফ তথা হানাফী মাজহাবের নিয়ম। তবে তায়াম্মুমের জন্য মাটির মধ্যে হাত ঘষা অপরিহার্য নয়। যে জায়গার ওপর ধূলো পড়ে আছে এবং শুকনো মাটি সম্বলিত যে কোনো জায়গায় হাত ঘষে নেয়াও বৈধ বিবেচিত হবে।

জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে যে-

মহিলাদের হায়েজ (ঋতুকালীন সময়) ও নেফাসের (সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরের সময়) বিষয়েও ইদ্দতপূর্ণ (মেয়াদ) হওয়ার পর গোসলের মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন করা জরুরী।

সর্বোপরি-

সব ধরনের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাই ঈমানের অর্ধেকের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

আলফিত্রাতু খামসুন (পাঁচটি জিনিস সুস্থ স্বভাবের দাবি রাখে)-

ক. আলখিতানু অর্থাৎ খৎনা করা;

খ. ওয়াইস্তহ্দাদু অর্থাৎ ক্ষৌরকার্য করা;

গ. ওয়া ক্বস্সুশ শারিবি অর্থাৎ গোঁফ খাটো করা;

ঘ. ওয়া তাক্বলিমুল আযফারি অর্থাৎ নখ কাটা;

ঙ. ওয়া নাৎফুল ইবিত্বে অর্থাৎ বগলের লোম উপড়ানো (বগলের নিচের লোম উপড়ানো উত্তম, তবে চাঁছাও জায়িজ আছে। মূল উদ্দেশ্য হলো তা পরিষ্কার করা)।[155]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন-

ইন্নাল্লাহা নাযিফুন ইউহিব্বুন নাযাফাতা ফানাযিফু আফ্নিয়াতাকুম

অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন; তিনি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন; তাই তোমরা বাড়ি ঘরের আঙ্গিনাকেও পরিচ্ছন্ন রাখো।[156]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানো নিয়মে পবিত্রতা অর্জন করে ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভের তাওফিক দান করুন।

প্রতি ওয়াক্ত সালাত কায়েমে আজানের ভূমিকা

আজান ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দশন। এর সঙ্গে জরিয়ে আছে ইসলামের অন্যতম বিধান নামাজ। আজানই মুসলমানদের নামাজের কথা মনে করিয়ে দেন। জানিয়ে দেয় মহান রবের সামনে দাঁড়িয়ে একনিষ্ঠ চিত্তে তাকে স্মরণের সময় হয়েছে। সব কাজ রেখে মসজিদ পানে চলার আহ্বান আজান।

মুয়াজ্জিনের আজান শুনে উত্তর দেওয়া এবং আজানের পর দোয়া পড়ার ফজিলত অত্যাধিক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আজানের পর দোয়া পাঠকারীর জন্য রয়েছে ফজিলতপূর্ণ পুরস্কার। কী সেই দোয়া ও ফজিলত?

---

155 সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম।

156 জামে আত তিরমিজি

আজানের পর দোয়া ও মুনাজাত মুলত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরুদ ও প্রশংসা। নবিজির দরুদ পাঠ ও প্রশংসায় মিলবে পরকালের সুপারিশ। এর চেয়ে বড় পুরস্কার মুমিনের জন্য আর কী হতে পারে! হাদিসের বর্ণনায় এসব ফজিলত, দরুদ ও দোয়া ওঠে এসেছে।

আজানের আরবি দোয়া:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَاد

আজানের বাংলা উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা রববা হা-যিহিদ্ দা‘ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াস সালা-তিল ক্বা-’ইমাতি আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা ওয়াব্‘আছহু মাক্বা-মাম মাহমূদাল্লাযী ওয়া‘আদতাহ, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী‘আদ।[157]

অর্থ: “হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব্ব! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ওসিলা তথা জান্নাতের একটি স্তর এবং ফযীলত তথা সকল সৃষ্টির উপর অতিরিক্ত মর্যাদা দান করুন। আর তাঁকে মাকামে মাহমূদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছে দিন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।[158]

আজানের ফজিলত

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর আজানের প্রচলন হয়। আজানের ফজিলত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আনসারী মাযিনী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) তাকে বললেন, আমি দেখছি তুমি বকরি চরানো এবং বন-জঙ্গলকে

---

[157] বুখারি হাদিস নং: ৬১৪]

[158] বুখারি ১/২৫২,নং ৬১৪

ভালোবাস। তাই তুমি যখন বকরি চরাতে থাকো বা বন-জঙ্গলে থাকো তখন উচ্চকণ্ঠে আজান দাও। কেননা, জিন, ইনসান বা যেকোনো বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়াজ্জিনের আওয়াজ শুনবে, সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে স্বাক্ষ্য দিবে। আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, একথা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে শুনেছি।[159]

১. হজরত জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আজান শুনে এ দোয়া পড়বে-

اللَّهُم ربِّ هذه الدَّعْوَة التَّامة، والصَّلاة القَائمة، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةِ وَالفَضِيلة، وابْعَثْه مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذي وعَدْتَه

অর্থ: 'হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান ও আসন্ন ছালাতের তুমি মালিক। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওয়াসিলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন। এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর। যার ওয়াদা তুমি করেছ।'

কেয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ পাওয়ার অধিকারী হবে।[160]

আরেক হাদিসে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, 'যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে শুনবে, তখন সে যেরূপ বলে, তদ্রূপ বলবে। এরপর আমার ওপর সালাত পাঠ করবে; করণ যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ১০ বার সালাত (রহমত) প্রদান করবেন।

এরপর আমার জন্য অসিলা চাইবে, কারণ অসিলা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান। আল্লাহর একজন মাত্র বান্দাই এই মর্যাদা লাভ করবেন এবং আমি আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য অসিলা প্রার্থনা করবে, তাঁর জন্য শাফায়াত পাওনা হয়ে যাবে।[161]

---

159 বুখারী, ৫৮২

160 বুখারি, মিশকাত

161 সহিহ মুসলিম: ১/২৮৮, হাদিস নং: ৩৮৪

মুয়াজ্জিন আজান দেওয়ার সময় অন্যদের উচিত আজানের জবাব দেওয়া। হাদিসে আজানের জবাব দেওয়ার বিষয়ে অনেক সওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসুল! মুয়াজ্জিনদের মর্যাদা যে আমাদের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমিও তা-ই বল, মুয়াজ্জিন যা বলে। তারপর আজান শেষ হলে (আল্লাহর কাছে) চাও। (তখন) যা চাইবে তা-ই দেয়া হবে।[162]

২. হজরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনে এ দোয়া পড়বে-

أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رضيت بالله ربًا وبمحمد ﷺ رسولًا وبالإسلام دينًا

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতিত কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। আমি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসুল হিসেবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে খুশী হয়েছি। তার গুনাহসমূহ মাফ করা হবে।[163]

আজানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিন মুসলমানের গুনাহ ক্ষমা করে পরকালে তার সুপারিশ দিয়ে ধন্য করবেন।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে আজানের উত্তর দেওয়াসহ দোয়া ও দরুদের মাধ্যমে নবিজির সুপারিশ পাওয়ার তাওফিক দান করুন। হাদিসের ওপর যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

---

[162] আবু দাউদ, মেশকাত

[163] মুসলিম ও মিশকাত

৪. সালাতের সময়সমূহ:

সময় বলতে যে সময়কে আল্লাহ তা’আলা সালাত আদায়ের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই সময়কেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন, ’’নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মু’মিনদের ওপর ফরয।[164]

সালাতের সময় সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর জিবরীল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সরাসরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সালাতের সময় সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

عَن عبد اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاة فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان» . رَوَاهُ مُسلم

আবদুল্লাহ বিন ’আমর (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সূর্য ঢলে পড়ার সাথে যুহরের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মানুষের ছায়া যখন তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়, তখন ’আসরের সালাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়। ’আসরের সালাতের ওয়াক্ত যুহরের সালাতের পর থেকে যে পর্যন্ত সূর্য হলদে রং ধারণ না করে এবং সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের লালিমা মিশে যাবার আগ পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত থাকে। আর ’ইশার সালাতের ওয়াক্ত মাগরিবের সালাতের পর থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত। ফজরের (ফজরের) সালাতের ওয়াক্ত ফাজর (ফজর) অর্থাৎ- সুবহে সাদিকের উদিত হবার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। অতঃপর সূর্যোদয় হতে শুরু করলে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) হতে বিরত থাকবে। কেননা সূর্যোদয় হয় শায়ত্বনের (শয়তানের) দু’ শিং-এর মধ্য দিয়ে।[165]

---

164 (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪: ১০৩)

165 মুসলিম

عَن بُرَيْدَة قَالَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ» يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَين مَا رَأَيْتُمْ» . رَوَاهُ مُسلم

বুরায়দাহ্ (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, আমাদের সাথে এ দু’ দিন সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় কর। প্রথমদিন সূর্য ঢলে পড়লে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রাঃ)-কে হুকুম দিলেন আযান দিতে। বিলাল (রাঃ)আযান দিলেন। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিলে বিলাল (রাঃ) যুহরের সালাতের ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দিলেন। অতঃপর (’আসরের সময়) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি ’আসরের সালাতের ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দিলেন। তখনও সূর্য বেশ উঁচুতে ও পরিষ্কার সাদা। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি মাগরিবের ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দিলেন। তখন সূর্য দেখা যাচ্ছে না। এরপর বিলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি ’ইশার সালাতের ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দিলেন, যখন মাত্র লালিমা অদৃশ্য হলো। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি ফজরের (ফজরের) সালাতের ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দিলেন। তখন ঊষা (সুবহে সাদিক) দেখা দিয়েছে।

যখন দ্বিতীয় দিন এলো তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, যুহরের সালাত ঠাণ্ডা পড়া পর্যন্ত দেরী করতে। বিলাল দেরী করলেন। রোদের তাপ ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত দেরী করলেন। তারপর ’আসরের সালাত আদায় করলেন। সূর্য

তখন উঁচুতে অবস্থিত, কিন্তু সালাতে পূর্বের দিনের চেয়ে বেশী দেরী করলেন। মাগরিবের সালাত আদায় করলেন লালিমা অদৃশ্য হবার কিছুক্ষণ আগে। আর এ দিন ’ইশার সালাত আদায় করলেন রাতের এক তৃতীয়াংশ শেষ হবার পর। অতঃপর ফজরের (ফজরের) সালাত আদায় করলেন বেশ পরিষ্কার হওয়ার পর। সবশেষে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি কোথায়? সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এই যে আমি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাদের জন্য সালাত আদায় করার ওয়াক্ত হলো, তোমরা যা (দু’ সীমা) দেখলে তার মধ্যস্থলে।[166]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِين كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله وَصلى بِي يَعْنِي الْمغرب حِين أفطر الصَّائِم وَصلى بِي الْعشَاء حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي

ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জিবরীল আমীন খানায়ে ক্বা’বার কাছে দু’বার আমার সালাতে ইমামাত করেছেন। (প্রথমবার) তিনি আমাকে যুহরের সালাত আদায় করালেন, সূর্য তখন ঢলে পড়েছিল। আর ছায়া ছিল জুতার দোয়ালির (প্রস্থের) পরিমাণ। ’আসরের সালাত আদায় করালেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার এক গুণ হলো। মাগরিবের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করালেন যখন সিয়াম পালনকারী (রোযাদার) ইফত্বার করে। ’ইশার সালাত আদায় করালেন যখন ’শাফাক্ব অস্তমিত হলো। ফজরের (ফজরের) সালাত আদায় করালেন যখন সিয়াম পালনকারীর জন্য পানাহার হারাম হয়।

[166] মুসলিম

দ্বিতীয় দিন যখন এলো তিনি আমাকে যুহরের সালাত আদায় করালেন, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার এক গুণ। ’আসরের সালাত আদায় করালেন, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ। মাগরিবের সালাত আদায় করালেন, সায়িমগণ (রোযাদাররা) যখন ইফত্বার করে। ’ইশার সালাত আদায় করালেন, তখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি ফাজর (ফজর) আদায় করালেন তখন বেশ ফর্সা। এরপর আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই আপনার পূর্বেকার নবীগণের সালাতের ওয়াক্ত। এ দুই সময়ের মধ্যে সালাতের ওয়াক্ত।[167]

আজান ও ইকামাত সম্পর্কিত কিছু মাসআলাহ

আজান দাঁড়িয়ে দিতে হবে, বসে দেওয়া মাকরুহ। তবে অসুস্থ ব্যক্তি একাকী নামাজ পড়ার জন্য বসে আজান দিলে দোষ নেই। আজান উচ্চ আওয়াজে দিতে হবে। আজানের সময় দুই হাতের শাহাদাত আঙুল দ্বারা উভয় কানের ছিদ্রপথ বন্ধ করা মুস্তাহাব। আজানের শব্দগুলো থেমে থেমে ও দীর্ঘ স্বরে বলা এবং ইকামাতের শব্দগুলো দ্রুত বলা সুন্নত। যদি আজানের বাক্যগুলো থেমে থেমে না বলা হয়, তাহলে পুনরায় আজান দেওয়া মুস্তাহাব। তবে ইকামাতের বাক্যগুলো থেমে থেমে বললে পুনরায় ইকামাত দেওয়া মুস্তাহাব নয়। কাবার দিকে মুখ করে আজান ও ইকামাত দেওয়া সুন্নত। অন্য দিকে মুখ করে দেওয়া মাকরুহ।

সঠিক সময়ে নামাজ আদায়ের উপকার:

মুসলমানদের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ এবং সেটা সময়মতো পড়াও ফরজ। নামাজের যখন ওয়াক্ত হবে তখনই নামাজ পড়তে হবে। নামাজের ওয়াক্ত গড়িয়ে শেষ হয়ে গেলে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা নামাজ কায়েম করার হুকুম দিয়েছেন। জানার বিষয় হলো, নামাজ কায়েম করার অর্থ কী? মুফাসসিরগণ নামাজ কায়েমের ব্যাপারে অনেকগুলো মতামত

[167] আবূ দাঊদ ও তিরমিযী

ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে একটা মত হলো, তিনটি বিষয় একত্রিত হলেই নামাজ কায়েম হয়- ১. সুন্নত মোতাবেক অর্থাৎ নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামাজ পড়েছেন সেভাবে নামাজ পড়া। ২. সময়মতো নামাজ পড়া। ৩. খুশু-খুজুর সঙ্গে নামাজ পড়া[168] এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহর নামাজ কায়েমের নির্দেশ মানতে হলে ওয়াক্ত মতো নামাজ পড়তে হবে। হাদিসে নবীজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় আলাদা আলাদা করে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। কোন নামাজের ওয়াক্ত কখন শুরু, কখন শেষ, সব নবীজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন। আর ওয়াক্তের মধ্যে কোন নামাজ কখন পড়া উত্তম সেটাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

আমরা ওয়াক্তের শুরুতে অথবা যে নামাজ যখন পড়া উত্তম, তখন না পড়ে অনেক সময় দেরি করে পড়ি। অলসতা করি। এটা উচিত নয়। এর দ্বারা অবশ্য আমাদের ওপর যে নামাজের হুকুম অর্পিত ছিল সেটা আদায় হয়ে যায় কিন্তু ফজিলত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। অসংখ্য হাদিসে শুরুর ওয়াক্তে নামাজ পড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘শুরুর ওয়াক্তে নামাজ পড়লে আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জন করা যায় আর শেষ ওয়াক্তে নামাজ পড়লে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়[169] এখানে ‘আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়’ কথাটির অর্থ হলো, নামাজের যে বিধান তার ওপর ছিল সেটা থেকে মাফ পাওয়া যায়। কিন্তু শুরুর ওয়াক্তে পড়লে আল্লাহর যে সন্তুষ্টি লাভ হওয়ার কথা ছিল সেটা পাওয়া যায় না। হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আরেক হাদিসে নবীজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘হে আলী! তিনটি ব্যাপারে দেরি করো না, ১. যখন নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায় তখন নামাজ পড়তে দেরি করো না। ২. যখন জানাজা উপস্থিত হয়ে যায় তখন জানাজা পড়তে দেরি করো না।

[168] তাফসিরে জালালাইন

[169] তিরমিজি : ১৭২

৩. সন্তান যখন বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যায় এবং উপযুক্ত সঙ্গী পাওয়া যায় তখন বিয়ে দিতে দেরি করো না।[170] আরেক হাদিসে এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জানতে চেয়েছেন, কোন আমল সর্বোত্তম? নবীজি তিনটি আমলের কথা বলেছেন। সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন, সময়মতো নামাজ পড়া।[171]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, যতগুলো হাদিসে ওয়াক্তমতো নামাজ পড়া, শুরুর ওয়াক্তে নামাজ পড়ার কথা এসেছে, সবগুলো হাদিস বুঝতে হলে আমাদের দুটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত, ওয়াক্তমতো নামাজ পড়া মানে অলসতা করে একদম শেষ ওয়াক্তে নামাজ না পড়া। আর প্রতি নামাজের ওয়াক্তের মধ্যে একটা উত্তম সময় আছে, সেই সময়ে নামাজ পড়া। আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে জামাতের যে সময় দেওয়া আছে, সেগুলো সাধারণত ওয়াক্তের উত্তম সময়ে দেওয়া। আমরা অলসতা না করলে ওয়াক্ত মতো নামাজ পড়ার বিধানের ওপর আমল করতে পারব। আবার শুরু ওয়াক্তের যে ফজিলত আছে সেটাও হাসিল করতে পারব ইনশা-আল্লাহ। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘নিশ্চয় মুমিনদের ওপর নামাজ ফরজ করা হয়েছে সময়মতো।[172] আল্লাহ তায়ালা আমাদের নামাজসমূহ সুন্দরভাবে সময়ের প্রতি খেয়াল রেখে আদায় করার তওফিক দান করুন।

সালাত ফার্‌য হওয়ার জন্য শর্তাবলীঃ

সালাত ফার্‌য হওয়ার জন্য রয়েছে ৩টি শর্ত। এ তিনটি শর্ত একত্রে একসাথে যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার উপর সালাত ফার্‌য। শর্তগুলো হলো যথা:-

[170] তিরমিজি : ১৭১

[171] তিরমিজি : ১৭৩

[172] সুরা নিসা : ১০৩

(এক) মুসলমান হওয়া।

শুধু সালাতই নয় বরং অন্যান্য যে কোন ‘ইবাদাতের ক্ষেত্রেই মুছলমান হওয়া পূর্বশর্ত। কেননা ইসলাম ছাড়া কোন ‘ইবাদাতই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করার পরই কেবল তার উপর ইসলামের অন্যান্য আদেশ-নিষেধগুলো বর্তাবে। আর মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে একমাত্র সত্যিকার রাব্ ও মা‘বূদ বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করে, মুহাম্মাদকে আল্লাহ্‌র রাছূল বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করে এবং ইছলামকে একমাত্র দ্বীন বলে সর্বতোভাবে (মনে-প্রাণে, কথায় ও কাজে) গ্রহণ করে।

অমুসলিমদের যাবতীয় ‘ইবাদাত প্রত্যাখ্যাত। তারা যদি পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণও ভালো কাজে ব্যয় করে তথাপি তা আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবে না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র এককত্বে এবং রাছূল এর রিসালাতে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাসী হবে। এ সম্পর্কে ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:- وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

অর্থাৎ:- আমি তাদের কৃতকর্মগুলো সামনে আনব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলি-কণায় পরিণত করব।

(দুই) জ্ঞানবান তথা ভালো-মন্দ বুঝতে সক্ষম হওয়া।

কান্ড-জ্ঞানহীন ব্যক্তির উপর শারী‘য়াতের কোন বিধানই প্রযোজ্য নয় যতক্ষণ না তার জ্ঞান-বুদ্ধি ফিরে আসে। তাই শারী‘য়াতের বিধান থেকে তিন ব্যক্তি দায়মুক্ত- (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি (২) পাগল (৩) ছোট বাচ্চা। এর প্রমাণ হলো- রাছূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

অর্থ- তিন ধরনের লোকের কোন হিসাব লিখা হয় না- ঘুমন্ত ব্যক্তি যে পর্যন্ত না ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, ছোট বাচ্চা যে পর্যন্ত না প্রাপ্তবয়স্ক (বালিগ) হয়, পাগল যে পর্যন্ত না জ্ঞান ফিরে পায়।

(তিন) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

কারো উপর সালাত, সিয়ামসহ ইসলামের যে কোন ‘ইবাদাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শারী‘য়াত নির্ধারিত মানদন্ডে তার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পূর্বশর্ত। কেননা ভালো-মন্দ বুঝার মত বয়সে উপনীত হওয়া, এটা হলো শারী‘য়াতের বিধানাবলী উপলব্ধি ও গ্রহণ করার যথাযথ সময়।

এর প্রমাণ হলো উপরোল্লেখিত হাদীছ। এতে রাছূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, শিশু বালিগ না হওয়া পর্যন্ত তার কোন হিসাব লিখা হয় না।

নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলীঃ

উসুলুল ফিকহ এর পরিভাষায় শর্ত হলো: “**যার শূন্যতা শূন্যতাকে আবশ্যক করে; কিন্তু যার অস্তিত্ব অস্তিত্বকে আবশ্যক করে না।**” তাই নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তগুলো হলো: যেগুলোর ওপর নামায শুদ্ধ হওয়া নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি এই শর্তগুলোর কোন একটি বাদ পড়ে তাহলে নামায সহিহ নয়। সেগুলো হচ্ছে:

প্রথম শর্ত: নামাযের ওয়াক্ত বা সময় হওয়া। এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আলেমদের ইজমার ভিত্তিতে ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বে নামায আদায় করা সহিহ নয়। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের উপর অবশ্য কর্তব্য।[173]

[173] সূরা নিসা, আয়াত: ১০৩

কুরআনে কারীমে নামাযের সময়সূচী এজমালিভাবে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا "সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং (কায়েম করুন) ফজরের কুরআন (সালাত)। নিশ্চয় ফজরের কুরআন (সালাত) উপস্থিতির সময়।[174] আয়াতে কারীমাতে لِدُلُوكِ الشَّمْس দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সূর্য মধ্যাকাশ থেকে হেলে পড়া। আর إِلَى غَسَقِ اللَّيْل দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- মধ্যরাত হওয়া। মধ্যাহ্ন থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সময়টুকু যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা এ চার ওয়াক্ত নামাযের সময়কে অন্তর্ভুক্ত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্নাহতে বিস্তারিতভাবে এ সময়সূচী বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় শর্ত: সতর ঢাকা। যে ব্যক্তি নামায পড়লেন; অথচ তার সতর উন্মুক্ত তার নামায সহিহ নয়। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক গ্রহণ কর।[175]

ইবনে আব্দুল বার্‌র (রহঃ) বলেন: যে ব্যক্তি নিজেকে আচ্ছাদিত করার মত পোশাক সংগ্রহের সাধ্য থাকা সত্ত্বেও পোশাক ত্যাগ করে উলঙ্গ হয়ে নামায পড়েছে; তার নামায বাতিল মর্মে আলেমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[176]

তৃতীয় ও চতুর্থ শর্ত: পবিত্রতা। পবিত্রতা দুই প্রকার: হাদাছ (নাপাক অবস্থা) থেকে পবিত্রতা এবং নাজাস (নাপাক বস্তু) থেকে পবিত্রতা।

১। গুরু হাদাছ ও লঘু হাদাছ থেকে পবিত্রতা। যে ব্যক্তি হাদাছগ্রস্ত (যে ব্যক্তির ওযু নেই) অবস্থায় নামায পড়ে আলেমদের ইজমার ভিত্তিতে তার নামায সঠিক নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:

---

[174] সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৭৮

[175] সূরা আরাফ, আয়াত: ৩১

[176] **নামাযীর সতরের স্তরভেদ রয়েছে: ১। লঘু সতর:** এটি হচ্ছে সাত বছর থেকে দশ বছর বয়সী পুরুষের সতর। তার সতর হচ্ছে লজ্জাস্থানদ্বয়: সামনের লজ্জাস্থান ও পেছনের লজ্জাস্থান। **২। মধ্যম সতর:** দশ বছর ও তদূর্ধ্ব বছর বয়সীর সতর: নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানটুকু। **৩। গুরু সতর:** প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাধীন নারীর নামাযের সতর: কেবল চেহারা ও হাতের কব্জিদ্বয় ছাড়া নারীর গোটা দেহ। আর পাদ্বয় প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে।

“তোমাদের কারো ওযু ভঙ্গ হলে; ওযু না-করা অবধি আল্লাহ্‌ তার নামায কবুল করেন না।[177]

২। নাজাস থেকে পবিত্রতা। যে ব্যক্তি জেনেশুনে, স্মরণ থাকা অবস্থায় কোন নাপাকি নিয়ে নামায পড়ে তার নামায সহিহ নয়। নামাযীর জন্য তিনটি স্থানের নাপাকি দূর করা আবশ্যক:

প্রথম স্থান: নিজ দেহ। তাই নামাযীর দেহে কোন নাপাকি থাকতে পারবে না। এর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিসে তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন নিশ্চয় এ দু'জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে কোন কবিরা গুনাহর কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন চোখলখুরী করে বেড়াত। অপরজন পেশাব থেকে নিজেকে পবিত্র রাখত না।[178]

দ্বিতীয় স্থান: পোশাক। এর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) এর হাদিসে তিনি বলেন: “একবার এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল: আমাদের কেউ যখন তার পোশাকে হায়েযগ্রস্ত হয় তখন সে কি করবে; সে ব্যাপারে অবহিত করুন। তিনি বললেন: খসে ফেলে দিবে। এরপর পানি দিয়ে ঘষে ধুয়ে ফেলবে এবং তাতে নামায পড়বে।[179]

তৃতীয় স্থান: নামায পড়ার স্থান। এর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে আনাস বিন মালিক (রাঃ) এর হাদিসে তিনি বলেন: “একবার এক বেদুঈন এসে মসজিদের এক প্রান্তে পেশাব করে দিল। লোকেরা তাকে ধমকালো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করলেন। যখন সে পেশাব শেষ করল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় এক বালতি পানি আনার ও পেশাবের উপর ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[180]

---

[177] সহহি বুখারী: ৬৯৫৪

[178] সহিহ মুসলিম: ২৯২

[179] সহিহ বুখারী: ২২৭

[180] সহিহ বুখারী

পঞ্চম শর্ত: ক্বিবলা অভিমুখী হওয়া। তাই যে ব্যক্তি সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন ফরয নামায ক্বিবলার দিক ব্যতীত অন্যদিকে ফিরে পড়বে তার নামায আলেমদের ইজমার ভিত্তিতে বাতিল। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "সুতরাং আপনি আপনার চেহারাকে মসজিদে হারামের দিকে ফেরান। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের চেহারাগুলোকে মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও।[181]

এবং নামায অসঠিকভাবে আদায়কারী ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "এরপর তুমি কিবলামুখী হবে এবং তাকবীর দিবে।[182]

ষষ্ঠ শর্ত: নিয়ত করা। যে ব্যক্তি নিয়ত ছাড়া নামায পড়ল; তার নামায বাতিল। দলিল হচ্ছে উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস: "সকল আমল নিয়ত দ্বারা মূল্যায়িত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে সেটাই তার পাপ্য।" আল্লাহ্ তাআলা নিয়তহীন কোন আমল কবুল করেন না।

উপরোল্লেখিত শর্তগুলো নামাযের সাথে খাস। এগুলোর সাথে প্রত্যেক ইবাদত শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাধারণ শর্তগুলোও যোগ করতে হবে। সেগুলো হল: ইসলাম, বুদ্ধিমত্তা ও বুঝবান হওয়া।

সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়টি। এজমালিভাবে সেগুলো হচ্ছে: ইসলাম, আকল, বুঝবান হওয়া, অপবিত্রতা দূর করা, নাপাকি দূর করা, সতর ঢাকা, ওয়াক্ত প্রবেশ করা, কিবলামুখী হওয়া এবং নিয়ত করা।

---

[181] সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৪৪

[182] সহিহ বুখারী: ৬৬৬৭

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সমূহ

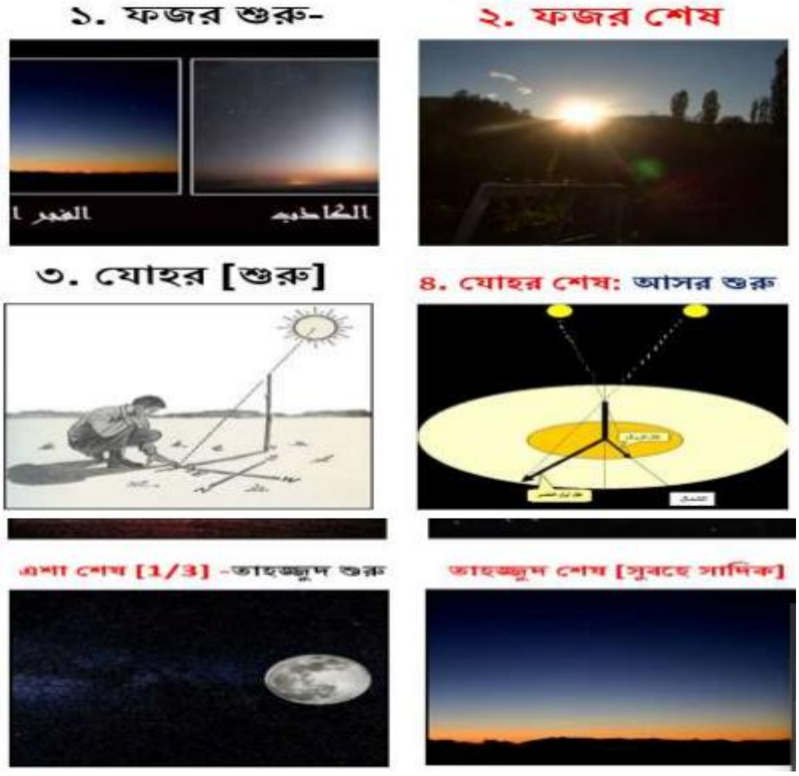

ফজর: ফজর নামাজের সময় শুরু হয় সুবহি সাদিক হওয়ার সাথে সাথে এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। রাতের শেষে আকাশের পূর্ব দিগন্তে লম্বা আকৃতির যে আলোর রেখা দেখা যায় তাকেই বলে সুবহে সাদিক।

যোহর: দুপুরের সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। ছায়া আসলি বাদে কোনো বস্তুর ছায়া দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত এর সময় থাকে। কোনো বস্তুর ঠিক দুপুরের সময় যে ক্ষুদ্র ছায়া থাকে তাকেই বলে ছায়া আসলি।

আসর: যোহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে সূর্যের রং হলুদ হওয়ার আগেই আসর সালাত আদায় করা উচিত।

মাগরিব: সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে যতক্ষন লালিমা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ সময় থাকে।

ইশা: মাগরিবের সময় শেষ হলেই ইশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহি সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে মধ্য রাতের আগেই এই নামাজ আদায় করা উত্তম।

জুমা: শুক্রবার আদায় করতে হয় । সালাতে আলাদা কোনো ওয়াক্ত নেই। যোহরের সময়ই এই নামাজ আদায় করতে হয়।

নামাজের নিষিদ্ধ সময়সমূহ:

তিন সময় সাললাত আদায় করা নিষিদ্ধ। যেমন: (ক) ঠিক সূর্যোদয়ের সময়। (খ) ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়। (গ) ঠিক সূর্যাস্তের সময়।

তিন সময়ে সালাত পড়া নিষেধ হওয়ার বিষয়ে সমস্ত ইমামদের ঐক্যমত হয়েছে। উকবা বিন আমের জুহানী রাযি. বলেন,

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

তিনটি সময়ে রাসুল আমাদেরকে সালাত পড়তে এবং মৃতের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়; যতোক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় থেকে নিয়ে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। যখন সূর্য অস্ত যায়।[183]

উল্লেখ্য -

যেহেতু সূর্যের উদয় ও অস্ত সব সময় একই সময়ে হয় না, সেহেতু ঘড়ির সময় অনুপাতে তা বর্ণনা করা এই পরিসরে কঠিন। তাই, এর জন্য স্থায়ী ক্যালেন্ডারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

[183] সহীহ মুসলিম: ১৩৭৩

সূর্যোদয়ের সময়; যতক্ষণ না তার হলুদ রঙ ভালোভাবে চলে যায়, আলো ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্য আনুমানিক ১৫-২০ মিনিট সময় প্রয়োজন হয়।

সালাতের মাকরুহ সময়:

সুবহে সাদিকের পর ফজরের ফরয সালাতের আগে দুই রাকাআত- সুন্নাত ছাড়া অন্য নফল সালাত পড়া মাকরুহ। চাই তা ঘরে পড়া হোক কিংবা মসজিদে। অতএব ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর তাহিয়্যাতুল অজু' বা দুখুলুল মসজিদ পড়া অনুচিত। তবে ফজরের সুন্নতের সাথে তাহিয়্যাতুল অজু[184] ও দুখুলুল মসজিদ সালাতের নিয়ত করে নিলে তার সওয়াব পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এবং জামাতের সময় হওয়া পর্যন্ত বাকি সময় তাসবীহ-তাহলীল, দরূদ শরীফ ইত্যাদি আদায় করা। হযরত হাফসা রাঃ থেকে বর্ণিত, নবীজী বলেন, إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وفى رواية إلا ركعتي الفجر

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর উদিত হবার পর ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন সালাত পড়তেন না।[185]

ইমাম তিরমিযী রাহি. বলেন,

وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

"আহলুল ইলম একমত যে, কোনো ফজরের সময় হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সময়ে ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত ছাড়া অতিরিক্ত নফল পড়াকে মাকরুহ মনে করেন।[186]

ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের নফল সালাত পড়া মাকরূহ।

আসরের সালাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত কোন সালাত পড়া

---

184 অজু করার পর অজুর অঙ্গগুলো শুকানোর পূর্বেই দুই রাকাত নামাজ পড়া মোস্তাহাব। ইসলামী পরিভাষায় এই সালাতকে তাহিয়্যাতুল অজু বলে।

185 সহীহ মুসলিম ১৭১১, সহিহ বুখারি ১১৭৩

186 তিরমিজি ৭৫

মাকরূহ। আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, আমি রাসুল কে বলতে শুনেছি,

ُلا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْس

"ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সালাত নেই। আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো সালাত নেই।[187]

উল্লেখ্য- পূর্বের প্রত্যেকটি মাকরূহ সময়ে (ফজর টু ফজরের সালাত এবং ফজরের সালাত টু সূর্যোদয় এবং আসর টু মাগরিব) কাযা সালাত, জানাযার সালাত এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করা মাকরূহ নয়।[188]

কেউ যদি ওই দিনের আসরের সালাত সঠিক সময়ে পড়তে না পারে তাহলে- সূর্যাস্তের আগে হলেও তা পড়ে নিতে হবে। কাযা করা যাবে না। কারণ রাসুল ইরশাদ করেন-

َمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْر

যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাকাআত পেল সে আসরের সালাত পেল।[189]

মাগরিবের সালাতের আযানের পর থেকে মাগরিবের সালাত পড়ার পূর্বে নফল সালাত পড়া মাকরূহ।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, َبين أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ إِلَّا الْمُغَرِب

"প্রতিটি দুই আযান (আযান ও ইকামাত) এর মাঝে (নফল) সালাত আছে মাগরিব সালাত ছাড়া।[190]

প্রত্যেক সালাতের আযান ও ইকামতে মাঝামাঝি সময়ে দুই রাকাআত সালাত পড়া নফল। আবশ্যক নয়। শুধু মাগরিব সালাতের ক্ষেত্রে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অর্থাৎ মাগরীবের আযান দিলে ফরজের আগে অন্য কোন সালাত নেই। হযরত তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাঃ কে প্রশ্ন করা হল, মাগরিবের (ফরজের আগে ও আজানের পর) আগে কোন সালাত আছে কি? তিনি বললেন,

---

187 সহীহ বুখারী ৫৫১

188 ফিকহুল ইবাদাহ লিল হালাবী

189 নাসায়ি ৫১৮

190 বায়হাকী, ৪১৭২

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا

আমি নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত কাউকে এ সময় সালাত পড়তে দেখিনি।[191]

উল্লেখ্য, এটি হচ্ছে ফিকহে হানাফী অনুযায়ী সালাতের হুকুম। তবে অন্যান্য ফিকহী মাযহাবে এ সময়ে সালাতের সুযোগ রয়েছে।

সালাত আদায়ের নিয়ম:

সব কাজেরই নিয়ম-পদ্ধতি আছে। নিয়মমতো কাজ করলে সুফল পাওয়া যায়। সালাত একটি বড় ইবাদত। সালাত আদায়েরও নিয়ম-পদ্ধতি আছে। মহানবি (স) নিজে সালাত আদায় করে সাহাবিগণকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ, তোমরাও সেভাবে সালাত আদায় করবে।'

মহানবি (স)- এর শেখানো নিয়মে সালাত আদায় করতে হবে। সালাতের সময় হলে আমরা পাক-পবিত্র হয়ে, পাকসাফ কাপড় পরব। তারপর পবিত্র জায়গায় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াব। মনে করতে হবে আমি আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তিনি আমাকে দেখছেন। তিনি আমার অন্তরের খবরও রাখছেন।

সালাতের নিয়ত করে আল্লাহু আকবর বলব। একে বলে তাকবিরে তাহরিমা ।

তাকবিরের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা দুই হাত কান বরাবর ওঠাবে। এরপর দুই হাত নাভির ওপর বাঁধবে। মেয়েরা দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠাবে। মেয়েরা হাত বাঁধবে বুকের ওপর ।

[191] আবু দাউদ ১২৮৪

হাত বাঁধার নিয়ম

বাম হাতের তালু নাভির ওপর রাখব। আর ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর রেখে কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কবজি ধরব। মাঝের ৩টি আঙুল বাম হাতের কবজির উপর বিছিয়ে রাখব। মেয়েরা শুধু বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে।

এরপর সানা পড়ব। সানা হলো: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُك

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। তোমার নাম বরকত ও কল্যাণময়। তোমার সম্মান অতি উচ্চে। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।'

এরপর গোপনে বলবে : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি দয়াময় পরম দয়ালু।

পরে সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোনো সূরা বা তার অংশ পাঠ করব। তারপর আল্লাহু আকবর বলে রুকু করব। রুকুতে অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম ' পড়ব।

রুকু করার নিয়ম:

এরপর তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে। দুই হাঁটুর ওপর দু হাতের আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত করে এমনভাবে রাখবে, মনে হবে যেন সে তা ধরে আছে। মাথা ও পিঠ সমান্তরাল রাখবে। এরপর বলবে: سبحان ربي العظيم অর্থাৎ পবিত্র-মহান আমার মহামহিম রব। এরপর মাথা উঠাবে এবং ইমাম ও একাকী নামাজ আদায়কারী বলবে: سمع الله لمن حمده অর্থাৎ প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ তাআলা শুনেছেন। আর সকলেই বলবে

ربنا ولك الحمد «হে আমাদের রব, সকল প্রশংসা আপনার জন্যেই।[192] রুকু থেকে উঠে, রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায়, দুহাত যেভাবে রেখেছিল, সেভাবে রাখা মুস্তাহাব।

রুকুতে দুই হাত দুই হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে মাথা, পিঠ ও কোমর এক বরাবর হয়। কনুই পাঁজর থেকে ফাঁক করে রাখতে হবে।

মেয়েরা বাম পায়ের টাখনু ডান পায়ের টাখনুর সাথে মিলিয়ে রাখবে। এরপর মাথা ঝুঁকিয়ে দুই হাতের আঙুলগুলো মেলানো অবস্থায় দুই হাঁটুর উপর রাখবে। কনুই পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং মাথা এতটুকু ঝুঁকাবে, যাতে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে।

এরপর 'সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদা' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায় 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলতে হবে। এরপর 'আল্লাহ্ আকবর' বলে সিজদাহ্ করতে হবে।

সিজদা করা ও সিজদা থেকে উঠার নিয়ম-

মুসল্লী তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবে। সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাঁটু প্রথমে রাখবে, এরপর হাত, এরপর কপাল ও নাক। দুই হাত কান বরাবর অথবা কাঁধ বরাবর কেবলামুখী করে বিছিয়ে দেবে।

দুই কনুই জমিন থেকে উঁচিয়ে রাখবে। বাহুর উর্ধ্বাংশ বগল, পেট ও রান থেকে দূরে রাখবে। সিজদাবস্থায় তিনবার বলবে: سبحان ربي الأعلى অর্থাৎ পবিত্র-মহান আমার রব, যিনি সর্বোর্ধ্ব। সিজদায় বেশি বেশি দুআ করবে।

এরপর তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে। এ সময় কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত উঠাবে না। বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসবে। ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখবে। এ পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখবে। দু হাত প্রশস্ত করে রানের ওপর রাখবে। হাতের আঙ্গুলগুলো থাকবে কেবলামুখী। এ সময় বলবে:

اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وارزقني

[192] তিরমিযী

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি রহম করুন। আমার ক্ষত দূর করুন। আমাকে আপনি হিদায়েত ও রিযিক দান করুন।[193]

এরপর তাকবীর দিয়ে প্রথম সিজদার মতোই দ্বিতীয় সিজদা করবে।

এরপর তাকবীর দেয়া অবস্থায় মাথা উঠাবে এবং দাঁড়ানোর পূর্বে স্থির হয়ে মূহুর্তকাল বসবে। মালিক ইবনে হুআইরেছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি স্থির হয়ে বসার পূর্বে দাঁড়াতেন না।[194]

এরপর হাতের ওপর ভর করে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে।

প্রথম রাকাতের মতোই দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে। তবে প্রথম রাকাতের মতো প্রারম্ভিক দুআ তথা ছানা পড়বে না।

প্রথমে দুই হাঁটু মাটিতে বা জায়নামাজে রাখতে হবে। তারপর দুই হাত মাটিতে রাখতে হবে। তারপর দুই হাতের মাঝখানে মাথা রেখে নাক ও কপাল মাটিতে রাখতে হবে। সিজদাহর সময় দুই হাতের আঙুলগুলো মিলিত অবস্থায় কিবলামুখী করে রাখতে হবে। দুই পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে মাটিতে লাগিয়ে রাখতে হবে। উভয় পা মিলিত অবস্থায় খাড়া থাকবে ।

মেয়েরা পা খাড়া রাখবে না। উভয় পা ডান দিকে বের করে দেবে এবং মাটিতে বিছিয়ে রাখবে।

ছেলেরা সিজদাহর সময় মাথা হাঁটু হতে দূরে রাখবে। হাতের কবজির উপরের অংশ মাটিতে লাগাবে না। পায়ের নলা উরু হতে পৃথক রাখবে।

মেয়েরা সর্বাঙ্গ মিলিত অবস্থায় সিজদাহ করবে। মাথা যথাসম্ভব হাঁটুর কাছে রাখবে। ঊরু পায়ের নলার সাথে এবং হাতের বাজু গাজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। সিজদাহে

---

193 বর্ণনায় তিরমিযী

194 বুখারী

অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা'' কলতে হয়। এরপর আল্লাহ্ আকবর বলে সোজা হয়ে বসে দুই হাত হাঁটুর ওপর রাখবে। তারপর আল্লাহ্ আকবর বলে দ্বিতীয় সিজদাহ্ করবে এবং পূর্বের মতো তসবি পড়বে। এরপর 'আল্লাহু আকবর' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এভাবে প্রথম রাকআত শেষ হবে। এরপর দ্বিতীয় রামাত শুরু হবে। দ্বিতীয় রাকআতেও প্রথম রাকআতের মতো যথারীতি সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা পড়ে রুকু, সিজদাহ্ করে সোজা হয়ে বসতে হবে। তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'' বলতে হবে। এভাবে দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত শেষ হবে।

তাশাহহুদ

প্রথম দু রাকাত পড়া শেষ হলে প্রথম তাশাহহুদের জন্য মুসল্লী বসবে। বাম পা বিছিয়ে ডান পা দাঁড় করিয়ে রেখে বসবে। উভয় হাত উরুর ওপর রাখবে। বাম হাত প্রশস্ত করে রাখবে। আর ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল ও অনামিকা আঙ্গুল গুটিয়ে রাখবে। আর মধ্যমা আঙ্গুলকে বৃদ্ধাঙ্গুলের সাথে চক্রাকারে রাখবে। আর তার তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা দেবে এবং তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। এবং বলবে:

التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

সমস্ত সম্মানজন সম্বোধন আল্লাহর জন্য। সমস্ত শান্তি-কল্যাণ ও পবিত্রতার মালিক আল্লাহ তাআলা। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।[195]

এরপর দরুদ পড়বে ও বলবে:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

হে আল্লাহ, আপনি মুহম্মাদের প্রতি এবং মুহাম্মদের পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমনিভাবে রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীমের প্রতি এবং ইবরাহীমের

[195] বুখারী

পরিবারের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মহাসম্মানিত। হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত নাযিল করুন, যেমনিভাবে আপনি রবকত নাযিল করেছেন ইবরাহীমের প্রতি এবং ইবরাহীমের পরিবারের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মহাসম্মানিত।[196]

এরপর বলবে: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم.

হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছি। আর গুনাহ তো কেবল আপনিই মাফ করেন। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।[197]

তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত হলে তাশাহহুদ অর্থাৎ আবদুহু ওয়া রাসুলুহ পর্যন্ত পড়ে 'আল্লাহ আকবর' বলে দাঁড়াতে হবে। এরপর পূর্বের মতো তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত শেষ করতে হবে। ওয়াজিব ও সুন্নত সালাত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা পড়তে হবে। কিন্তু ফরজ হলে অন্য সূরা মেলাতে হবে না। এভাবে যথারীতি তাশাহহুদ, দরূদ, দোয়া মাসুরা পড়ে প্রথমে ডানে এবং পরে বামে মুখ ফিরিয়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হবে।

সালাম

নামাজান্তে মুসল্লী তার ডানে ও বামে সালাম ফেরাবে এবং বলবে: السلام عليكم ورحمة الله [198]

---

196 আবু দাউদ

197 বুখারী

198 মুসলিম

চিত্রসহ সালাত আদায় (কায়েমের) করার নিয়ম নিয়ে:

জায়নামাজে দারানোর নিয়ম:-

জায়নামাজে দারানোর সময় দেখতে হবে যে দুই পায়ের মধ্যে খানিক টা ফাকা রাখতে হবে (চার ইঞ্চি এর মত) । পায়ের গোরালি এবং পা এর সামনের অংশ এর মধে সমান ফাকা রাখতে হবে।

আর জামায়াতে নামাজ পড়ার সময় সকলের ই পায়ের গোরালি যেন এক বরাবর থাকে।

জায়নামাজে দাড়িয়ে জায়নামাজের দোয়া পড়তে হবে।

জামাতে নামাজ পড়লে সকলে একটু চেপে চেপে দারাতে হবে।

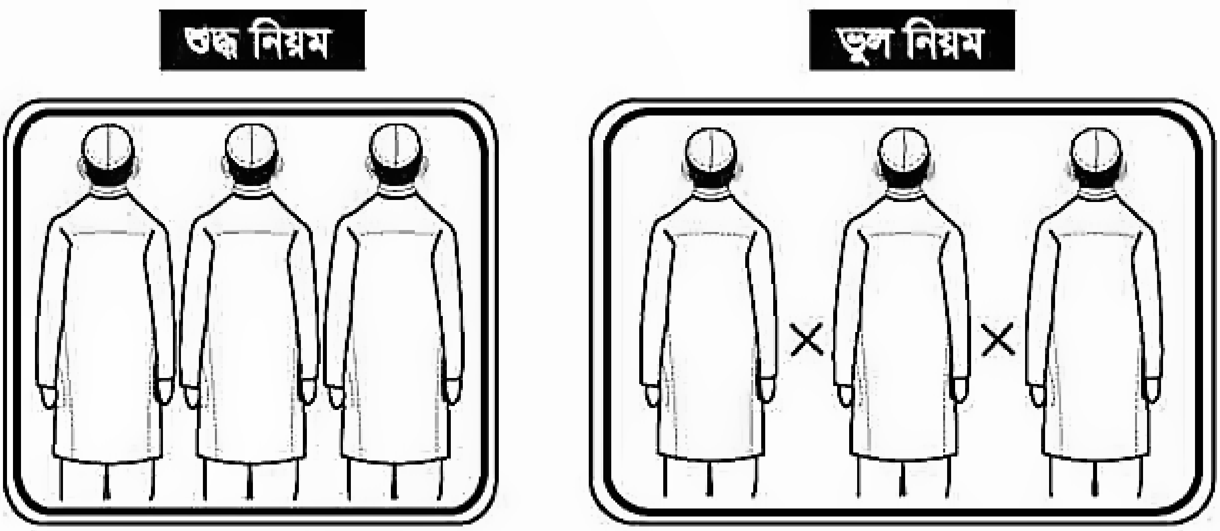

নিয়ত এবং তাকবির এর নিয়ম:-

এরপর নামাজের নিয়ত করতে হবে ।

নিয়ত করে (আল্লাহু আকবর) বলে তাকবির এর সময় হাত এর বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর রাখতে হবে এবং হতের অন্য আঙ্গুল গুলো সোজা এবং হাতের তালু কিবলামুখি রাখতে হবে।

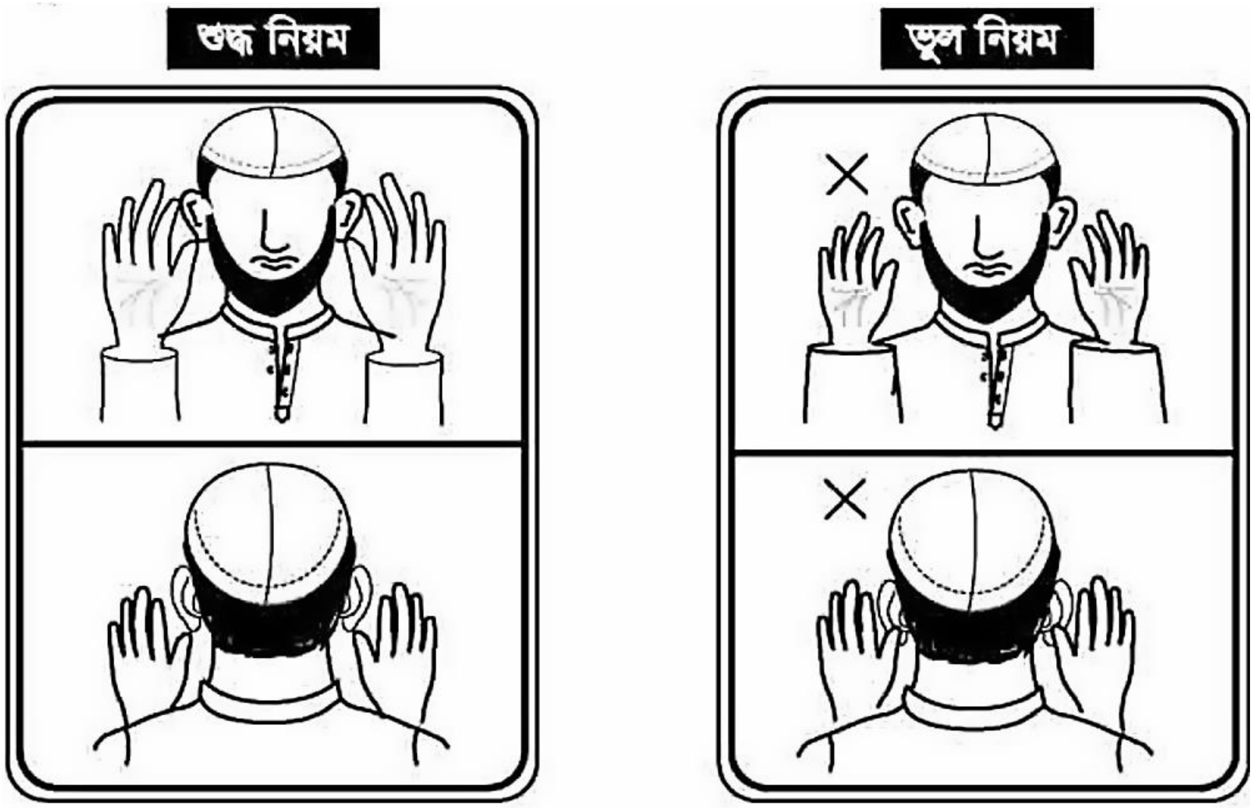

হাত বাধার নিয়ম:-

নিয়ত করার এর পর তাকবির (আল্লাহুআকবার) দিয়ে হাত বাধতে হবে। নাভির উপর (নাভি বরাবর) প্রথমে বাম হাত এর পর বাম হতের উপর ডান হাত রাখতে হবে এবং ডান হাতের বৃদ্ধাআঙ্গুল ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে বাম হাত ধরতে হবে । এবং সানা পড়তে হবে । সূরা ফাতিহা পড়ে সাথে অন্য একটি সূরা পড়তে হবে আর ইমামের পিছে নামাজ পড়লে চুপ করে থাকবে ।

চিত্র
ডান হাত
নাভী
বাম হাত
ডান হাত
শুদ্ধ নিয়ম
ডান হাত
ভুল নিয়ম

সানা ও সূরা পড়া সময় সোজা হয়ে দারিয়ে থাকতে হবে ।

সানা ও সূরা পড়ার সময় সিজদাহ করার জায়গার উপর তাকিয়ে থাকতে হবে।

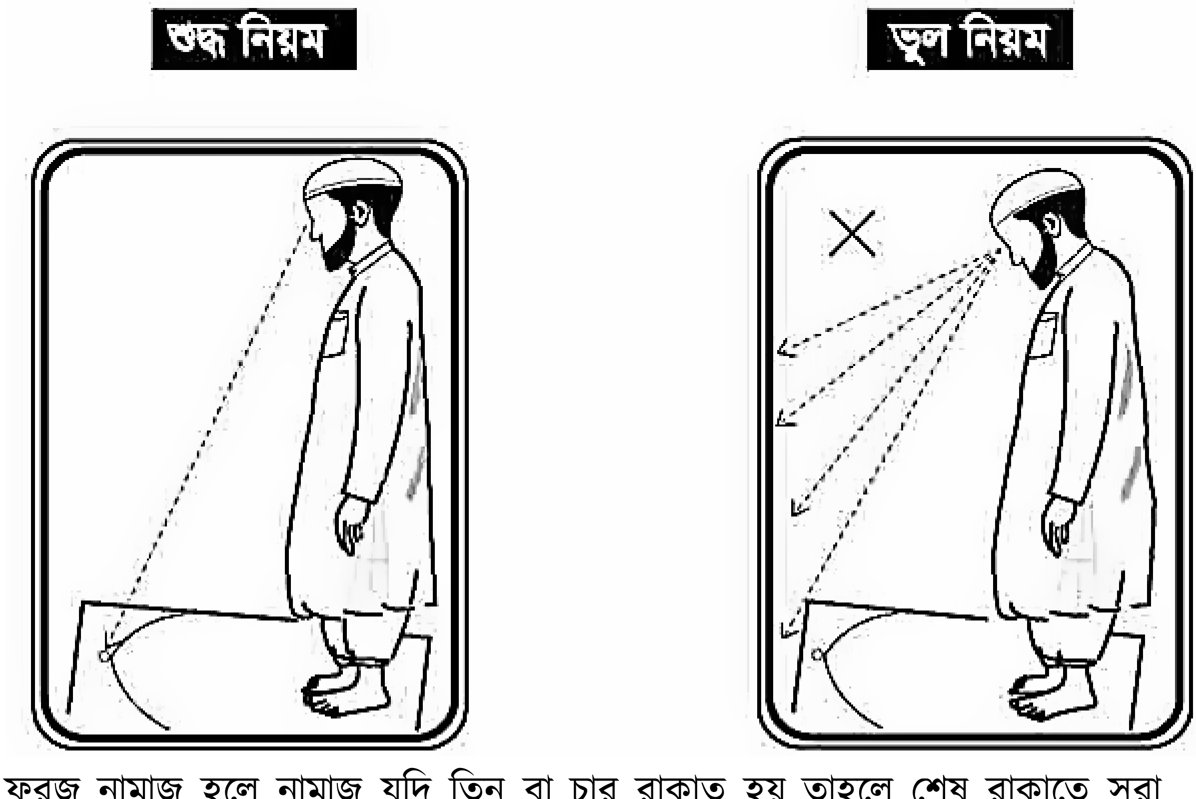

ফরজ নামাজ হলে নামাজ যদি তিন বা চার রাকাত হয় তাহলে শেষ রাকাতে সূরা ফাতিহা এর পর কোনো সুরা পড়ার দরকার নেই ।

আর সুন্নাত নামাজ হলে আগের রাকাতগুলো-এর মত ই পড়তে হবে ।

রুকু করার নিয়ম :-

সানা ও সূরা পড়া শেষ হলে হাত ছাড়তে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে হাত ছারার সময় হাত যেন পিছনে না যায়।

আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যেতে হবে।

এবার রুকু করার সময় দুই হাত হাটুর উপর রাখার সময় হাত টান রাখতে হবে । এবং ঘার ও পিঠ সোজা করে এক বরাবর রাখতে হবে। ও বলতে হবে (সুবহানা রব্বিয়াল আজিম)

এবং দুই পায়ের মাঝখানে তাকিয়ে থাকতে হবে ।

রুকু করার সময় হাটু টান টান রাখতে হবে ।

শুদ্ধ নিয়ম

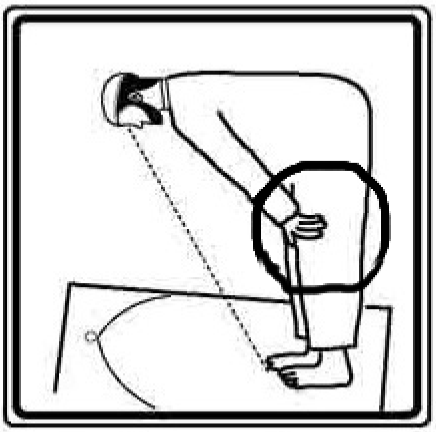

ভুল নিয়ম

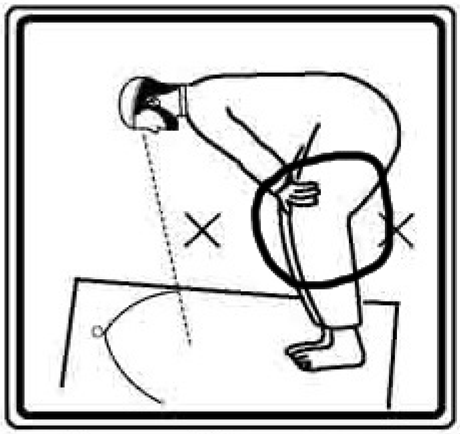

এবার ইমাম সাহেব (সামিআল্লাহু হুলিমান হামিদা) বললে মুকতাদি রা উঠে সোজা হয়ে দারাবে এবং বলবে (রব্বানা লাকাল হামদ)

এবার (আল্লাহু আকবার) বলে সিজদাহ এ যেতে হবে সিজদাহে যাওয়ার সময় স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে।
হাত জানুর উপরে রেখে হাটু কিছুটা বাকিয়ে ধিরে ধিরে বসতে হবে।

পর্যায়ক্রমে সিজদাহে যাওয়া

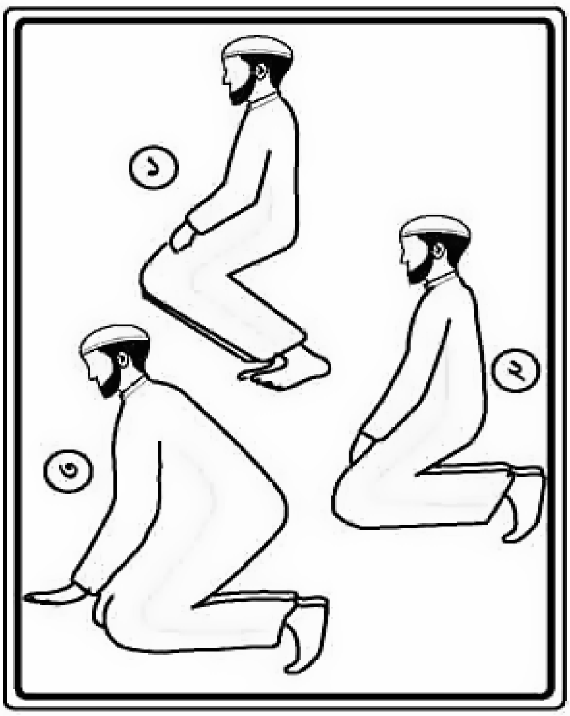

এভাবে যাওয়া অনিয়ম

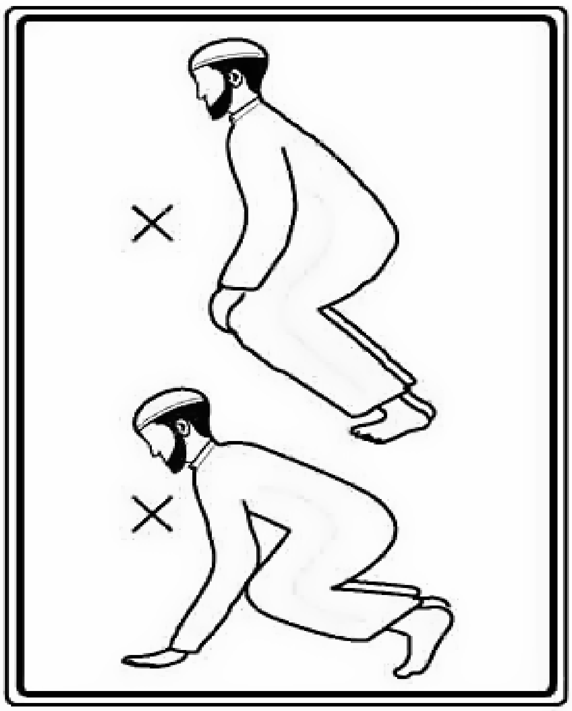

বসার পর জায়নামাজে হাত রেখে সিজদাহ করতে হবে । এখানে সিজদাহ এ যাওয়ার

সময় জায়নামাজে প্রথমে প্রথমে নাক তারপর কপাল লাগাতে হবে এবং বলতে হবে (সুবহানা রব্বিয়াল আআলা) ।

সিজদাহ করার সময় দুই হাত সোজা রাখতে হবে এবং এর বৃদ্ধাঙ্গুল দুটি কান এর লতি বরাবর রাখতে হবে এবং অন্য আঙ্গুল গুলো সোজা ভাবে একসাথে লাগিয়ে রাখতে হবে ।

শুদ্ধ নিয়ম

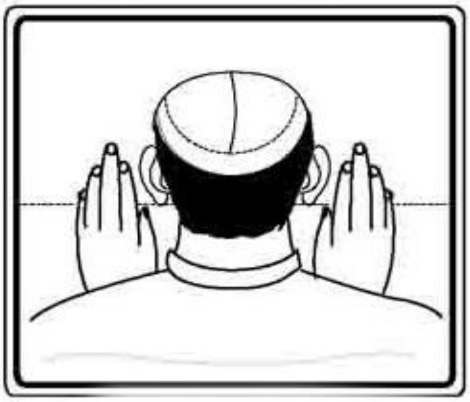

ভুল নিয়ম

শুদ্ধ নিয়ম

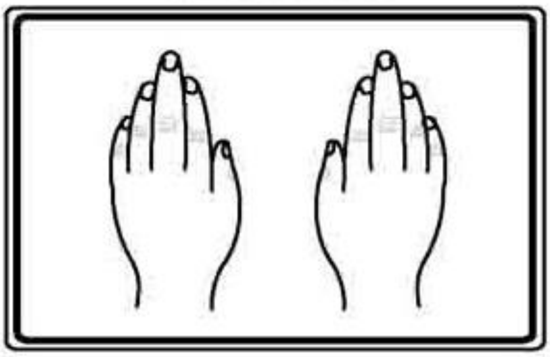

ভুল নিয়ম

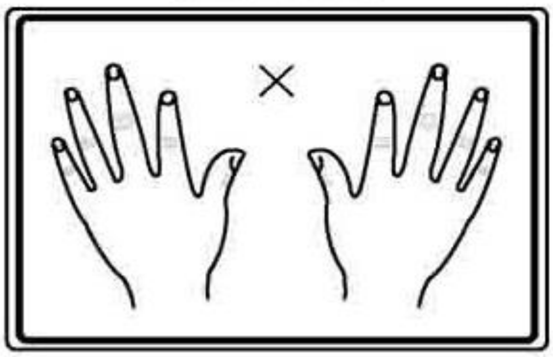

সিজদাহ করার সময় শরির একটু ছারিয়ে রাখতে হবে । শরির গুটিয়ে রাখা যাবে না।

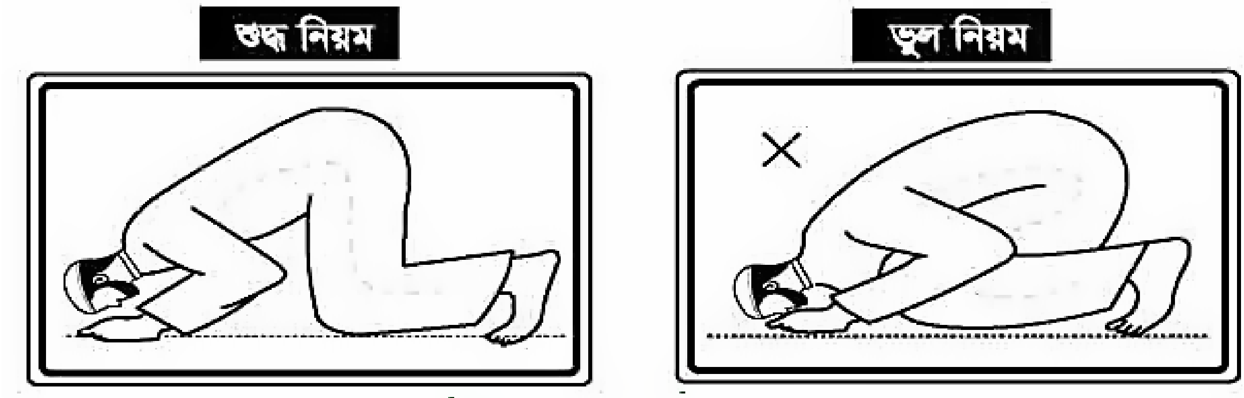

সিজদাহ করার সময় হাতের কুনুই লাগিয়ে রাখা যাবে না কুনুই উচু করে রাখতে হয়।

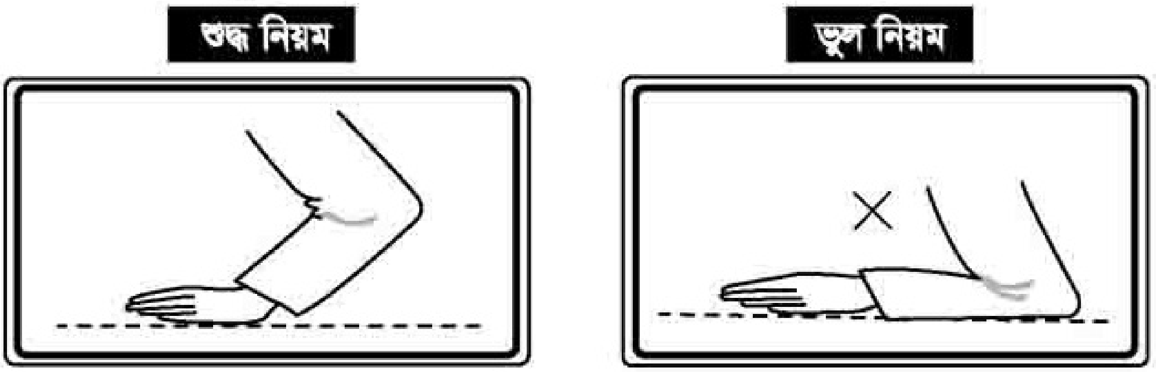

সিজদাহে থাকা অবসথায় পা এর আঙ্গুল গুলো বাকা করে কিবলার দিকে রাখতে হবে এবং পা কিছুটা ফাকা রাখতে হবে ।

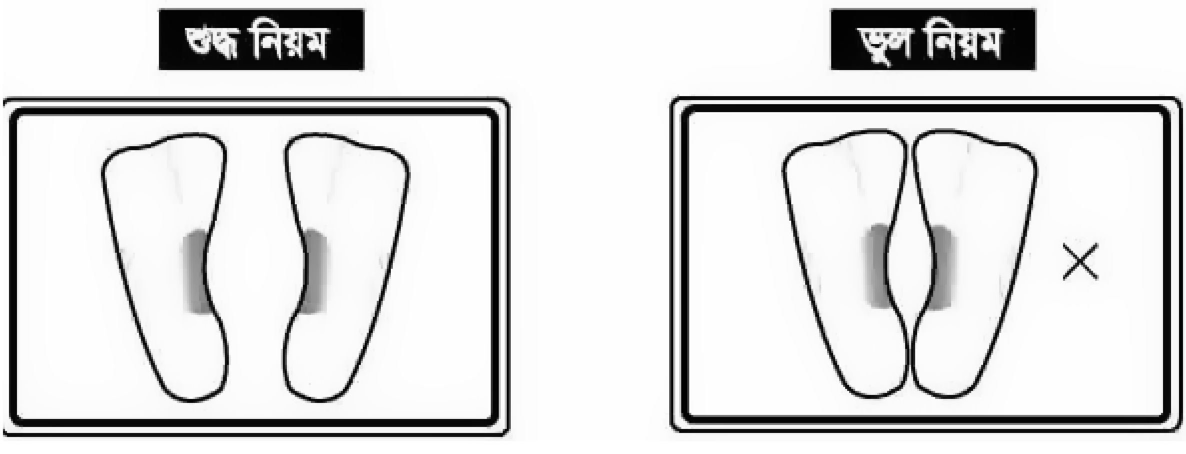

আল্লাহু আকবার বলে উঠতে হবে। উঠার সময় আগের মত স্টেপ বাই স্টেপ উঠতে হবে,

বৈঠকে বসার সময় বাম পা এর উপর বসতে হয় এবং ডান পা সোজা করে রাখতে হবে ও পা এর আঙ্গুল গুলো বাকিয়ে কিবলামুখি রাখতে হবে ।

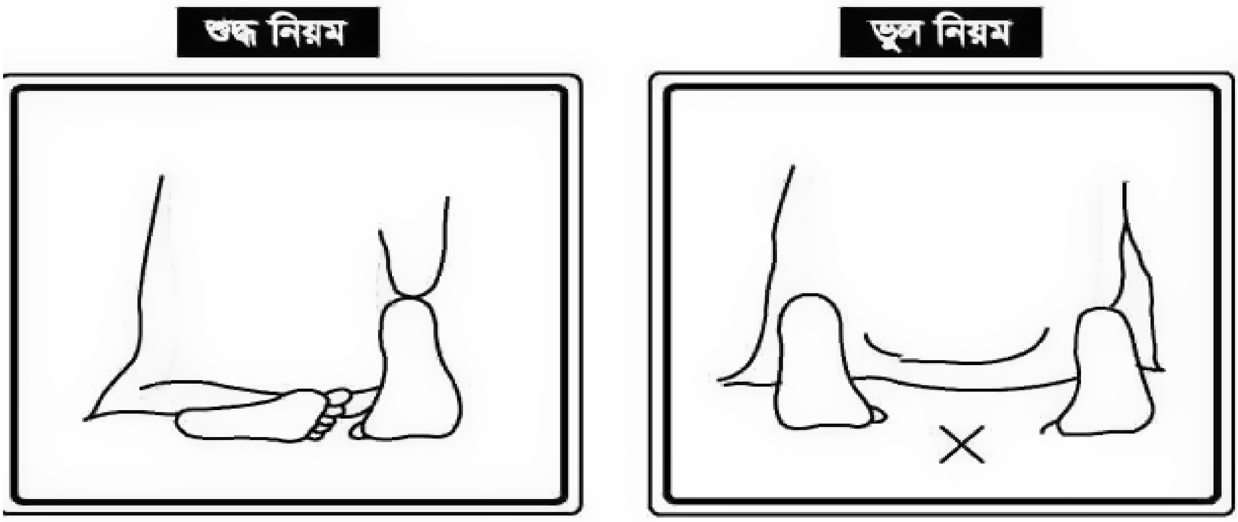

নামাজ তিন অথবা চার রাকাত হলে দুই রাকাত শেষ হওয়ার পর বৈঠকে বসতে হয়। বৈঠকে বসে (তাসহুদ) পাঠ করতে হবে ।

তাসহুদ পরার সময় হাত হাটুর উপরে রাখতে হবে । হাত নামিয়ে দেয়া যাবে না।

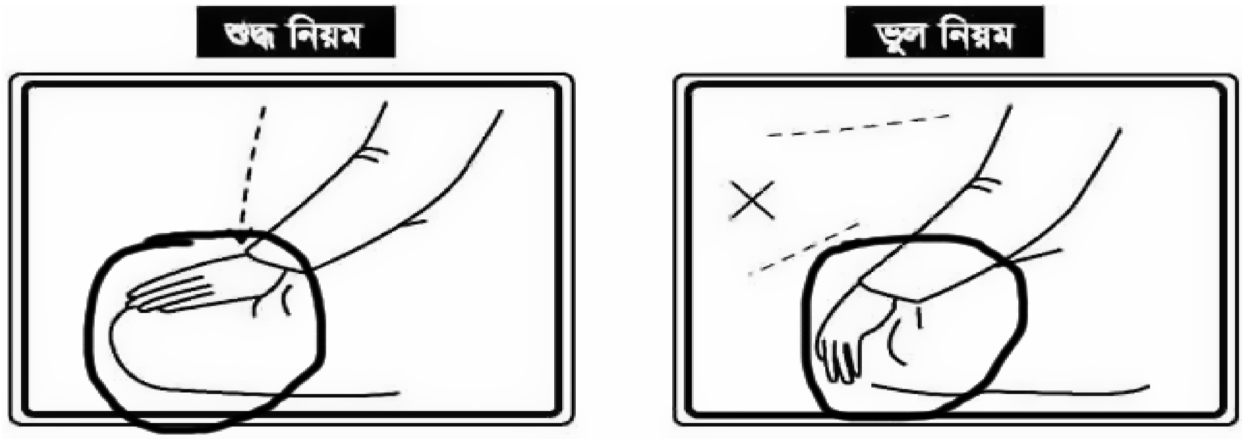

তাসহুদ পাঠ করার সময় যখন (আসহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাহু) বলার সময় ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল সামান্য তুলতে হবে।

শুদ্ধ নিয়ম

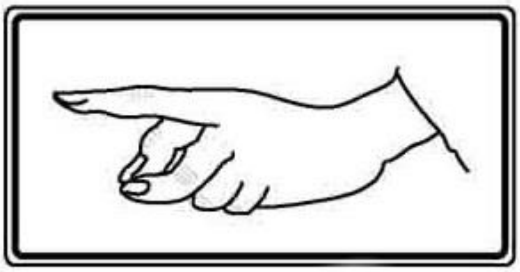

ভুল নিয়ম

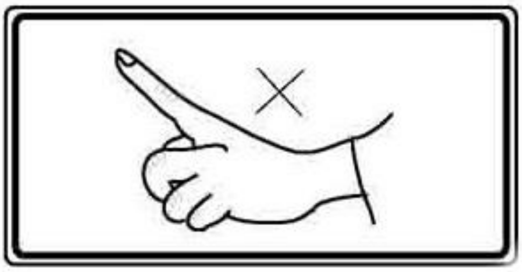

চিত্র

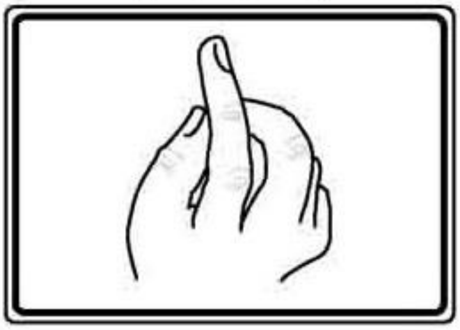

আর যখন তিন অথবা চার রাকাত শেষ হয়ে যাবে তখন (তাসহুদ) এর পর (দরুদ) তার পর (দুআ মাসুরা) পাঠ করতে হবে ।

যদি নামাজ দুই রাকাত হয় তা হলে (তাসহুদ) (দরুদ) ও (দুআ মাসুরা) পাঠ করতে হবে।

(দুআ মাসুরা) শেষ করার পর সালাম(আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ) ফিরাতে হবে ।

সালাম ফিরানোর সময় নজর কাধের উপর থাকতে হবে। খেয়াল রাখতে নজর যেন অন্যদিকে যায় ।

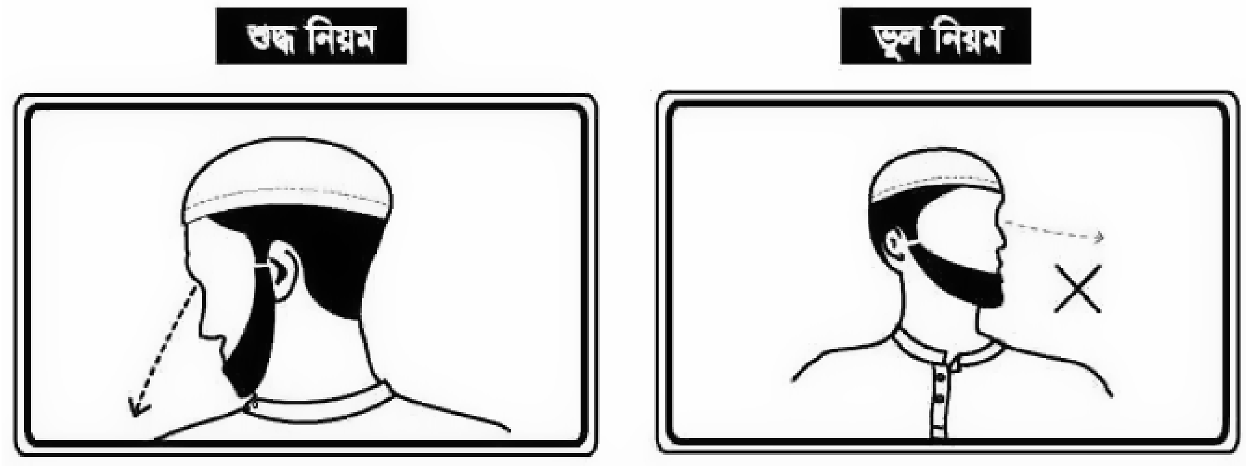

মুনাজাত :-

মুনাজাত করার সময় হাত একটু ফাকা রাখতে । হাত এর আঙ্গুল গুলো স্বাভাবিক ভাবে রাখতে হবে ।

তবে হাত বেশি ফাকা রাখা যাবে না ।

হাত একসাথে লাগিয়ে রাখা যাবে না।

মুনাজাত এর সময় নজর দুই হাতেের মাঝখানে রাখতে হবে।

নামাজ শেষে দুআ-যিকর:

তিনবার أستغفر الله আমি আল্লাহর মাগফিরাত চাচ্ছি) বলা।[199]

এরপর বলা: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام

হে আল্লাহ, আপনি শান্তি। আর শান্তি আপনার পক্ষ থেকেই আসে। আপনি বরকতপূর্ণ, হে বড়ত্ব ও সম্মানের মালিক![200]

এরপর বলা:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد

আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। এবং তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আপনি যা দেবেন তাতে বাধাদানকারী কেউ নেই। আর আপনি যা দেবেন না তা দেয়ার কেউ নেই। কোনো মর্যাদাশালীকে তার মর্যাদা (আপনার আযাবের ব্যাপারে) কোনো উপকার করতে পারে না।[201] এরপর বলা:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। এবং তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো উপায় ও ক্ষমতা নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। নিয়ামত তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর। উত্তম প্রশংসাসমূহও তাঁর। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমরা তাঁর দীন তাঁরই নিমিত্তে একনিষ্ঠভাবে পালন করি, যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।[202]

سبحان الله পবিত্র মহান আল্লাহ তাআলা (৩৩ বার)

الحمد لله সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার (৩৩ বার)

الله أكبر আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় (৩৩ বার)।

---

199 মুসলিম

200 মুসলিম

201 বুখারী

202 মুসলিম

শততম বারে বলবে: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। এবং তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[203]

নামাজান্তে পঠিতব্য আরেকটি দুআ হলো: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার যিকর, আপনার শুকরিয়া এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত আদায়ের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন।[204]

আয়াতুল কুরসী পড়া। সূরা ইখলাস, সূরা আল ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়া।[205]

ফজরের নামাজে সালামের পর এই দুয়া পড়া: اللهم إني أسألك علما نافعا ، ورزقا طيبا ، وعملا متقبلا

হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম, উত্তম রিযক এবং কবুল হওয়া আমল প্রার্থনা করি।[206]

আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর দিয়ে নামাজ শুরু করতেন। সূরা ফাতিহা পড়তেন। যখন তিনি রুকুতে যেতেন মাথা উপরের দিকেও রাখতেন না আবার একেবারে সোজাও করতেন না, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পর্যায়ে রাখতেন। যখন তিনি রুকু থেকে উঠতেন সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতেন না। আর যখন তিনি সিজদা থেকে উঠতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। তিনি প্রতি দু রাকাত পরপর আত্তাহিয়াতু পড়তেন। তিনি বাম পা বিছিয়ে দিতেন ও ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তিনি শয়তানের ন্যায় উপবেসন থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিতেন। আর হিংস্রপ্রাণী যেভাবে দু বাহু জমিনে বিছিয়ে রাখে সেভাবে মুসল্লী ব্যক্তির দু বাহু জমিনে বিছিয়ে রাখতে বারণ করতেন। আর তিনি সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করতেন।[207]

---

203 মুসলিম

204 আবু দাউদ

205 মুসলিম

206 ইবনে মাজাহ

207 মুসলিম

শয়তানের ন্যায় উপবেসন করার অর্থ হলো নিতম্বের ওপর বসে দু পা সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা এবং দু হাত মাটিতে রাখা ঠিক কুকুরের বসার মতো।

মাসায়েল

মুসল্লীদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছেন যারা তাশাহ্হুদের সময় ও দুই সিজদার মধ্যখানে ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে বসলে খুব ব্যথা অনুভব করেন। যদি অবস্থা এমন হয় তাহলে যেভাবে বসলে কষ্ট হয় না, সেভাবেই বসতে পারবে; কেননা কষ্টকর অবস্থা সহজতার আগমন ঘটায়।

নামাজের আকার-প্রকৃতিতে নারী ও পুরুষ সমান। তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কিছু বিষয়ে নারীর নামাজ পুরুষের নামাজ থেকে ভিন্ন।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েমের নির্দেশ:

পবিত্র কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশনা যেভাবে এসেছেঃ

কুরআন হাদিসের জ্ঞানে পারদর্শী নন, অথচ নিজেদের অতি জ্ঞানী কিংবা মহাপন্ডিত ভাবেন এমন কিছু লোক বলে থকেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তো কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয়। অথচ, প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা মিরাজের রাতে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ৫০ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারিত করে উম্মতের জন্য উপহারস্বরূপ দান করেছেন। আর মানুষের জন্য প্রতি দিন এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ বা অত্যাবশ্যক।

নামাজের এই ৫ টি ওয়াক্তও পবিত্র কুরআনুল কারিমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। দিন এবং রাতের যেই যেই সময়গুলোতে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হবে তারও নির্দেশনা এসেছে কুরআনুল কারিমে। যদিও অজ্ঞতার কারণে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশনা কোথায়? কুরআনে তো এ কথা উল্লেখ নেই। উহাদের কথার ভিত্তি নেই, কুরআনের আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় নির্ধারিত।

পবিত্র কুরআনুল কারিমের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি দিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়গুলো সুস্পষ্ট করে দিয়ে বলেন- فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

সুতরাং, তোমরা আল্লাহর তাসবিহ তথা পবিত্রতা ঘোষনা কর, যখন সন্ধ্যায় (মাগরিব ও ইশার নামাজ দ্বারা) উপনীত হবে এবং সকালে (ফজর নামাজ দ্বারা) উঠবে।[208]

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

আর অপরাহ্নে (আসর নামাজ দ্বারা) ও জোহরের সময়ে। আর আসমান ও জমিনে সব প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।[209]

আল্লাহ তাআলা সুরা রূমের উল্লেখিত দু'টি আয়াতে তাসবিহ বলতে নামাজ পড়াকে বুঝিয়েছেন। এ আয়াতদ্বয়ে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তাহলো- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়ের কথা।

প্রথম আয়াতে 'তুমসুনা' (সন্ধ্যা) শব্দ দ্বারা মাগরিব ও ইশা, 'তুসবিহুন' (সকাল) শব্দ দ্বারা ফজর নামাজকে বুঝিয়েছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতে 'আশিয়ান' (বিকাল/অপরাহ্ন) শব্দ দ্বারা আসর নামাজ এবং 'তুজাহিরুন' (দুপুর) শব্দ দ্বারা জোহর নামাজের সময়ের উল্লেখ করেছেন।[210]

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রাসূলে কারিম আজীবন আদায় করেছেন। যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কুরআনে নির্ধারিত নেই বলে নামাজীদের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিতে চান তাদের জন্য আরেকটি বিষয় জেনে রাখা উচিত যে, রাসূলে কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সারা জীবনের প্রাকটিস ছিল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। মুসলিম উম্মাহ তো তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শই ফলো করে থাকে। সুতরাং, বিভ্রান্তির বীজ যতই বুনতে চান না কেন, প্রকৃত মুসলিম কোনও অবস্থায়ই ষড়যন্ত্রের জালে আটকে যাবে

[208] সুরা রূম : আয়াত- ১৭

[209] সুরা রূম : আয়াত ১৮

[210] ফাতহুল কাদির, আহসানুল বয়ান

না। তারা রাসূলে কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ অনুযায়ী প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবেন। তাওফিক প্রার্থনা করছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলিম উম্মাহকে যাবতীয় ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টিকারীদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ইবাদতে মগ্ন-নিমগ্ন হওয়ার তাওফিক দান করুন। তাদের পেতে রাখা ঈমান বিধ্বংসী আকর্ষনীয় ও লোভনীয় বহুমাত্রিক রঙিন ফাঁদে পা না দিয়ে এবং সকল বিভ্রান্তির হাত থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে যথাসময়ে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

নামায কায়েম করুন সূর্য ঢলে পড়ার সময় (যোহর ও আসরের নামাজ) থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত (মাগরিব ও ইশার নামাজ) এবং প্রত্যুষের কোরআন পাঠ (ফজরের নামাজ); প্রকৃত পক্ষে প্রত্যুষের কোরআন পাঠ তো সাক্ষী-স্বরূপ।

(ক) ذلك এর অর্থ, ঢলা (সূর্যচলা) এবং غسق এর অর্থ, অন্ধকার। সূর্য ঢলার পর যোহর ও আসরের নামায এবং রাতের অন্ধকার পর্যন্ত বলতে মাগরেব ও এশার নামায উদ্দেশ্য। আর قرآن الفجر বলতে ফজরের নামায। এখানে কুরআন অর্থ নামায। ফজরের নামাযকে কুরআন বলে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, ফজরে কিরাআত পাঠ লম্বা হয়। এইভাবে এই আয়াতে পাঁচঅক্ত নামাযের কথা মোটামুটিভাবে এসে যায়। আর এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা হাদীসসমূহে পাওয়া যায় এবং তা বহুধাসূত্রে বর্ণিত উম্মতের পরম্পরাগত আমল দ্বারাও সাব্যস্ত।

(খ) অর্থাৎ, এই সময় ফিরিশতাগণ উপস্থিত হন; বরং (এ সময়) দিনের ও রাতের ফিরিশতাগণ একত্রে মিলিত হন। যেমন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী, সূরা বনী ইস্রাইলের তাফসীর) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাতের ফিরিশতাগণ যখন আল্লাহর নিকট যান, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন অথচ তিনি

ভালভাবে তা জানেন- "তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?" ফিরিশতাগণ বলেন, 'যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাযে রত ছিল এবং যখন আমরা তাদের কাছ থেকে ফিরে এলাম, তখনও তারা নামাযে রত ছিল।[211]

কোন কোন সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম করতে হবে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা-

১. ফজর- আয়াত নং (১৭:৭৮), (১১:১১৪), (৭:২০৫), (৩০:১৭), (৩৮:১৮) ও (৫০:৩৯)

২. জহুর- আয়াত নং (১৭:৭৮), (৩০:১৮) ও (৫০:৩৯)

৩. আছর- আয়াত নং (১১:১১৪), (০২:২৩৮), (৩০:১৭) ও (৩৮:১৮)

৪. মাগরিব- আয়াত নং (১৭:৭৮), (১১:১১৪) ও (০৭:২০৫)

৫. ইশা- আয়াত নং (১৭:৭৮), (১১:১১৪), (৩০:১৮) ও (৫০:৪০)

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের বিবরণ

"ফজর নামাযের" নির্দেশ-

"আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে (ফজর) ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না।" [212]

সুতরাং আল্লাহর মহিমা স্মরণ কর সূর্যাস্তের পূর্বে (যখন তোমরা সন্ধ্যায় পৌঁছাও) এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) (যখন তোমরা সকালে পৌঁছাও)।[213]

আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকালে (ফজর) ও বিকালে তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত;[214]

---

211 তাফসিরে আহসানুল বায়ান

212 সূরা আল-আ'রাফ: ০৭:২০৫

213 সূরা আর-রুম: ৩০:১৭

214 সূরা ছোয়াদ: (৩৮:১৮)

**অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং, সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন।[215]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي، يَعْلَي وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فنظر إلى القمر ليلة البَدْرِ فَقَالَ " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تَضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاة قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا " . ثُمَّ قَرَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

জারীর বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদ দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ফাজর ও আসরের সলাতে তোমরা পরাভূত না হয়ে সামর্থ্যবান হলে তাই করো (সলাত কাযা করো না)। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ): "এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।[216]

ফজর নামাযের ফযীলত:

অন্যান্য নামায অপেক্ষা ফজর নামাযের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বেশি। যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত দান করবেন। অথাৎ সে আল্লাহর দিদার লাভ করবে, এবং জান্নাতি ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে পূর্নিমার রাতের আকাশের চাঁদের মতোই স্পষ্ট দেখবে।[217]

---

215 সূরা ক্বাফ: (৫০:৩৯)

216 সূরাহ কাফ ৫০: ৩৯

217 বুখারী

যে ব্যক্তি নিয়মিত ফজরের নামায আদায় করবে, সে কখোনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা।[218]

ফজরের নামায আদায়কারী, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বরকতের দোয়া লাভ করবেন[219]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বলেছেন, 'মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাযের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামায নেই। এশা ও ফজর নামাযে কী ফযীলত রয়েছে মানুষ যদি তা জানত তবে উক্ত নামাযে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হত।[220]

ফজর নামাযে নামাযী মুনাফিকের তালিকা থেকে মুক্তিলাভ করে। ফজরের নামায মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্যকারী, কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের জন্য ফজর নামায আদায় কষ্টকর[221]

ফজরের সালাত আদায়ের ফলে ব্যক্তির মন ফুরফুরে, প্রফুল্ল হয়ে যায়[222]

ফজর সালাত আদায়ের জাগতিক উপকারের কথা স্বয়ং আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাকো। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঁট খুলে যায়, অজু করলে আরেকটি গিট খুলে যায়, অতঃপর সালাত আদায় করলে আরেকটি গিট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে ওঠে কলু কলুষ কালিমা ও আলস্য নিয়ে।[223]

---

218 সহিহ মুসলিম ৬৩৪

219 সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ

220 সহীহ বুখারী ও মুসলিম

221 বুখারী ৬৫৭,৬৪৪,২৪২০,৭২২৪; মুসলিম ৬৬১

222 সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম

223 বুখারী হাদিস নং-১১৪২

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "যে ব্যক্তি এশার সালাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন রাত্রির অর্ধাংশ ইবাদতে লিপ্ত থাকল এবং যে ফজর সালাত জামা'আতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করল।[224]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "ফজরের (সুন্নাত) দু'রাকাত সালাত দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম।[225]

এই ফযীলত তো শুধু ফজরের দু'রাকাত সুন্নাতে তাহলে ফজরের ফরয সালাতের ফযীলত কী হতে পারে? নিশ্চয় সুন্নাতের চেয়ে ফরজের সাওয়াব অনেক বেশি ও উত্তম। এ সমস্ত হাদীস ফজর সালাতের বিরাট প্রতিদান ও গুরুত্বের দলীল।ফজর নামায আদায়কারী আল্লাহর জিম্মায় চলে যায়

রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করল সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো।[226]

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করে, সে ব্যক্তি ঐ দিন আল্লাহর জিম্মায় চলে যায়। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব[227]

যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।[228]

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করবে, আল্লাহর ফেরেশতাগন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তিকে ভালো মানুষ হিসেবে সাক্ষী দিবে।[229]

---

224 সহীহ মুসলিম

225 সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিজি: ৪১৬

226 মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৯

227 সহিহ মুসলিম, তিরমিজি ২১৮৪

228 মুসলিম, হাদিস : ১৩৭৭

229 বুখারী-মুসলিম

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজর সালাত জামাতের সাথে আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার আমলে দাঁড়িয়ে সারারাত নফল নামাজ আদায়ের সওয়াব দিয়ে দেন![230]

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ভোরে হেঁটে হেঁটে ফজরের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার জন্য পরিপূর্ণ আলো দান করবেন।[231]

ফজরের নামাজ পড়লে ১০ পুরস্কার পাওয়া যায়:

ফজরের বিশেষ গুরুত্ব যেমন নামাজের মধ্যে আছে, তেমনি সময়ের মধ্যেও। কোরআনে সুরা ফজরের শুরুতে আল্লাহ তাআলা বলেন, শপথ ফজরের।[232]

ফজরের নামাজ পড়ার কয়েকটি উপকার

১. রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘যে জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত নফল নামাজ আদায় করল। আর যে ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল, সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।[233]

২. রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘ফজরের দুই রাকাত নামাজ দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।[234]

[230] সহিহ মুসলিম-১০৯৬

[231] আবু দাউদ ৪৯৪

[232] সুরা ফজর, আয়াত: ১

[233] মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৭

[234] মুসলিম, হাদিস: ১৫৭৩

৩. রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ফজরের নামাজ আদায় করল, সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো।[235]

৪. রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন, 'সেই মানুষটি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামাজ আদায় করে।[236]

৫. রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার চেয়ে বেশি ভারী কোনো নামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।[237]

৬. খলিফা হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর বরাতে একটি হাদিস জানা যায়। রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাজদের দিকে এক অভিযানে একটি সেনাদল পাঠান। তারা প্রচুর গণিমতের সম্পদ অর্জন করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। তাদের সঙ্গে যায়নি এমন একজন বলেন,'অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিমাণে ভালো গণিমত নিয়ে এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কোনো সেনাদলকে আমরা ফিরে আসতে দেখিনি।'

তখন রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দলের কথা বলব না, যারা এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তম গণিমত নিয়ে ফিরে আসে? যারা ফজরের নামাজে জামাতে হাজির হয়, (নামাজ শেষে) সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে

---

235 মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৯

236 মুসলিম, হাদিস: ১৩২২

237 বুখারি, হাদিস: ৬৫৭

আল্লাহ তাআলার জিকির করতে থাকে, তারাই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম গণিমতসহ প্রত্যাবর্তনকারী।[238]

৭. সাহাবি আনাস (রা.) বলেন যে রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'রাতের অন্ধকারে মসজিদগুলোয় যাতায়াতকারী ব্যক্তিদের কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নুরের সুসংবাদ দাও।[239]

৮. ফজরের সময় ফেরেশতাদের পালাবদল হয়। আর এ সময় বান্দা যা কিছু করে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে তা পেশ করেন। এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরে বলেন, 'ফেরেশতারা পালাবদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের নামাজে উভয় দল একত্র হয়। তারপর তোমাদের মাঝে রাতযাপনকারী দলটি উঠে যায়। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। জবাবে তাঁরা বলেন, 'আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনো তারা নামাজরত ছিলেন।[240]

৯. জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, 'একবার আমরা নবী করিম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ওই চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে।'

---

[238] সুনানে তিরমিজি: ৩৬৪১

[239] ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৭৮১

[240] বুখারি, হাদিস: ৫৫৫

১০. রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পেছনে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব, তুমি শুয়ে থাকো। তারপর সে যদি জেগে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে একটি গিঁট খুলে যায়, অজু করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়, তারপর নামাজ পড়লে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। না হলে সে সকালে ওঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য নিয়ে।[241]

"যোহরের নামাযের" নির্দেশ

এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য, নিশাকালে এবং যখন তোমরা মধ্যাহ্নে (যোহর) থাক।[242]

যোহর নামাযের ফযীলত:

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরই অনেক উপকারীতা ও ফজিলত রয়েছে। তেমনি যোহর নামাযও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। এর ফজিলত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেয়া হলো:
যোহরের সুন্নত নামাজ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি নিয়মিত যোহরের পূর্ব ও পরবর্তী চার রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে। দিবেন।[243]
আয়েশা (রা) বলেন, "নবী করীম (সা) কখনোই জোহরের পূর্বের ও ফজরের পূর্বের সুন্নত নামাজ ছাড়তেন না।[244]

---

241 বুখারি, হাদিস: ১১৪২

242 সূরা আর-রুম (৩০:১৮)

243 তিরমিজী:১/৫৫৩

244 সহীহ বুখারী:১১৮২

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, যোহরের সুন্নাত নামাজ আদায় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
নবী করীম (সা) বলেছেন, দৈনিক যোহরের নামাজ আদায়কারীকে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করেন।
জুমার দিন যোহরের নামাজের পরিবর্তে জুমার নামাজ আদায় করতে হয়। তাই এ ওয়াক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

"আসর নামাযের" নির্দেশ

"সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের (আসর) ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।[245]
অধিকন্তু, আল্লাহ সুনির্দিষ্টভাবে মধ্যবর্তী সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা অধিকাংশ সাহাবীগণের মতে আসরের সালাত।
'আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকালে ও বিকালে (আসর) তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত[246]
অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন।[247]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بن سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةَ
নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অন্যদের তুলনায় এ (এশার) নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে বেশী ভাল জানি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৃতীয়ার চাঁদঅস্ত গেলে এ নামায আদায় করতেন।[248]

---

245 সূরা আল বাক্কারাহ: ০২:২৩৮

246 সূরা ছোয়াদ: ৩৮:১৮

247 সূরা ক্বাফ: ৫০:৩৯

248 মিশকাত- ৬১৩, সহীহ্ আবূ দাউদ- ৪৪৫

আসর নামাযের ফযীলত:

ফজর নামাযের মত আসর নামাযেরও বিশেষ মর্তবা রয়েছে-

ফজর আসর নামায আদায়কারীর কিয়ামতের দিন আল্লাহর দিদার বা সাক্ষাৎ লাভ করবে।

জারির বিন আবদুল্লাহ (রদ্বিয়াল্লাহ আনহু) বর্ণনা করেন, 'একবার আমরা নবী করিম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ওই চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্য উদয়ের ও অস্ত যাওয়ার আগের সালাত আদায় করতে পারলে তোমরা তা-ই করো।

এ সালাতের মাধ্যমে সকাল-বিকাল ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। ফজর-আসরের সময় ফেরেশতাদের পালাবদল হয়। আর এ সময় বান্দা যা কিছু করে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে তা পেশ করে। এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরে বলেছেন, 'ফেরেশতারা পালাবদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। জবাবে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনো তারা নামাজরত ছিলেন।[249]

এ সালাতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। বিখ্যাত তাবেয়ি আবু বকর বিন উমারাহ তাঁর পিতা রুআয়বাহ থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু

---

[249] বুখারি, হাদিস

আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামাজ আদায় করে।[250]

"মাগরিবের নামাযের" নির্দেশ-

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, 'আপনি অধিকহারে আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন। আর সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।[251]
আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে (ফজর) ও সন্ধ্যায় (মাগরিব)। আর বে-খবর থেকো না।[252]

'আর নামায প্রতিষ্টা কর দিনের দুই প্রান্তেই (ফজর ও আছর) এবং রাতের নিকটবর্তী অংশে (মাগরিব ও ইশা); প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।[253]

তাফসিরবিদরা বলেন, এই আয়াতে পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজ আদায় করা। এই আয়াতে ফজর ও মাগরিবের নামাজের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারণ এ দুই সময়ে প্রকৃতিতে বড় দুটো পরিবর্তন হয়। দিন ও রাতের পালাবদল ঘটে।

---

[250] মুসলিম, হাদিস: ১৩২২

[251] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪১

[252] সূরা আল আ'রাফ (০৭:২০৫)

[253] সূরা হুদ (১১:১১৪)

সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, 'সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইমামতিতে মাগরিবের নামাজ আদায় করতাম।[254]

মাগরিবের নামাযের ফযীলত:

মাগরিবের নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অন্যতম। সন্ধ্যায় সূর্য পুরোপুরি ডুবে গেলে মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর পশ্চিম আকাশে দিগন্তলালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাজ পড়া যায়। তবে সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে মাগরিবের নামাজ আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব।

হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'আমার উম্মত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা মূল অবস্থায় থাকবে, যতদিন তারা মাগরিবের নামাজ আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব না করবে।[255] অর্থাৎ যথাসম্ভব সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই মাগরিবের নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া, বিলম্ব করা অনুচিত।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- নবীজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় নামাজ আদায় করতে মসজিদে যায় এবং যতবার যায় আল্লাহ তায়ালা ততবারই তার জন্য জান্নাতের মধ্যে মেহমানদারির উপকরণ প্রস্তুত করেন।[256]

বর্ণিত আয়াত ও হাদিস থেকে সকাল-সন্ধ্যার ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলতের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। এমনকি উল্লিখিত হাদিস থেকে এ-ও বোঝা যায়, মাগরিবের নামাজ অতি বরকতময়।

[254] বুখারি, হাদিস: ৫৬১

[255] আবু দাউদ, হাদিস: ৪১৮

[256] বুখারি, হাদিস: ৬২২

মাগরিবের ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজের কথা হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি এর ফজিলতও অপরিসীম। যে ব্যক্তি গুরুত্বের সঙ্গে মাগরিবের পরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।[257]

"এশার নামাযের" নির্দেশ:

এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য, নিশাকালে (এশা) এবং যখন তোমরা মধ্যাহ্নে (যোহর) থাক।[258]

'রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পশ্চাতেও।[259]

আর নামায প্রতিষ্ঠা কর দিনের দুই প্রান্তেই (ফজর ও আসর) এবং রাতের নিকটবর্তী অংশে (মাগরিব ও এশা); প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।[260]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بن سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ " كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ .

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি অন্যদের তুলনায় এ (এশার) নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে বেশী ভাল জানি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৃতীয়ার চাঁদঅস্ত গেলে এ নামায আদায় করতেন।[261]

---

257 তিরমিজি, হাদিস: ৬৩৬২

258 সূরা আর-রুম (৩০:১৮)

259 সূরা ক্বাফ (৫০:৪০)

260 সূরা হুদ (১১:১১৪)

261 iHadis.com-165 মিশকাত- (৬১৩), সহীহ্ আবূ দাউদ- (৪৪৫), হাদিসের মানঃ সহীহ।

এশার নামাযের ফযীলত:

এশার সালাতের মাধ্যমে অর্ধ রজনী ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এশার সালাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন রাত্রির অর্ধাংশ ইবাদতে লিপ্ত থাকল[262]

অন্য বর্ননায় এসেছে "যে ব্যক্তি এশার সালাত ও ফজর সালাত জামা'আতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করল।[263]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বলেছেন, 'মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাজের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামাজ নেই। এশা ও ফজর সালাতে কী ফযীলত রয়েছে মানুষ যদি তা জানত তবে উক্ত সালাতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হত।[264]

জুমার নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত:

জুমার নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ নামায। সপ্তাহের শুক্রবার এই নামাজের বিধান আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য দিয়েছেন। শুক্রবার সকাল থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদ-এলাকার সবাই একসঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করে। এটা মুসলমানদের জন্য সাপ্তাহিক মিলনমেলা। অন্যান্য কাজ-কর্ম সাময়িক বন্ধ রেখে এই মিলনমেলায় উপস্থিত হয়ে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য আল্লাহ তাআলা কঠিন আদেশ দিয়েছেন।

---

262 সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৭

263 সহীহ মুসলিম হাদিসঃ ৬৫৬

264 সহীহ বুখারী ও মুসলিম

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন (জুমার) নামাযের আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ছুটে যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝো।[265]

একদিকে আল্লাহ তাআলা জুমার নামাজে উপস্থিত হওয়ার কঠিন নির্দেশ দিয়েছেন, অন্যদিকে জুমার নামাজ আদায় করার বিপুল ফযিলত রেখেছেন। যে যতো আগে আসবে, সে ততোবেশি লাভবান হবে। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'শুক্রবার দিন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশতারা অবস্থান করে এবং (জুমার নামাজের) আগমনকারীদের নাম ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করতে থাকে। অতঃপর ইমাম যখন (মিম্বরে) বসেন, তারা লেখাগুলো গুটিয়ে নেয় এবং যিক্র (খুতবা) শোনার জন্য চলে আসে। মসজিদে যে আগে আসে, তার উদাহরণ সে ব্যাক্তির মত যে একটি উটনী কোরবানি করেছে। তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি গাভী কোরবানি করেছে। তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি ভেড়া কোরবানি করেছে এবং তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি মুরগি দান করেছে। পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি ডিম দান করেছে।[266]

শুধু তাই নয়, জুমার নামাজ জন্য মসজিদের দিকে অগ্রসর হলে, প্রতি কদমে এক বছর নফল রোযা ও নামায পড়ার সওয়াব পাওয়া যায় এবং জুমার নামাজ আদায় করলে দশ দিনের গোনাহ মাফ হয়।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিনে সকাল সকাল গোসল করল এবং গোসল করাল, তারপর ইমামের কাছে গিয়ে বসে চুপ করে

[265] সুরা জুমুআ, আয়াত :০৯

[266] মুসলিম, হাদিস নং: ২০২১

মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনল, প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে সে এক বছরের রোজা ও নামাজের সওয়াব পাবে।[267]

আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'জুমার দিনে যে ব্যক্তি গোসল করে জুমার নামাজের জন্য যায় এবং সামর্থ্য অনুযায়ী নামাজ আদায় করে, এরপর ইমাম খুতবা শেষ করা পর্যন্ত নীরব থাকে। এরপর ইমামের সঙ্গে নামাজ আদায় করে। তবে তার এ জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[268]

বস্তুত জুমার নামাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময়। আমরা অনেকেই জুমার নামাজকে অবহেলা করে থাকি। অযথা ও বিনা কারণে কখনও জুমার নামাজ পরিত্যাগ করা যায় না। এ ব্যাপারে শরিয়তে কঠিন সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অবহেলা করে তিন জুমা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাআলা তার হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন।[269]

৫ ওয়াক্ত ফরয এবং জুমার ফরজ ছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নামায আছে যেমন দুই ঈদের নামায, তারাবী নামায, বিতরের নামায; যেগুলোর গুরুত্ব ও ফযীলত কুরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

---

267 তিরমিজি, হাদিস নং: ৪৯৮

268 মুসলিম, হাদিস নং: ২০২৪

269 তিরমিজি হাদিস নং: ৫০২

প্রতিদিন আমল করা যায় এমন গুরুত্বপূর্ণ নফল নামায সমূহের গুরুত্ব ও ফযীলত:

মুসলমান হিসেবে আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পড়তে হয়। কিন্তু এমন কিছু নফল নামাজ আছে, যা পড়লে উভয় জাহানে ব্যাপক কল্যাণ সাধন হয়, হাদিসে কুদসিতে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন: আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়া'লা বলেন- 'আমার বান্দা নফলের মাধ্যআমার কাছাকাছি হয়। এক পর্যায়ে সে আমার প্রিয় ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে যায়।'। এসব নফল নামাজ পাঁচ ওয়াক্তে পড়তে হয়। এগুলো হচ্ছে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, জাওয়াল ও আউওয়াবিন।

তাহাজ্জুদ:

শেষ রাতে মানুষ যখন গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে, তখন তাহাজ্জুদ আদায়কারীরা মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসায় নিদ্রা ত্যাগ করে জেগে ওঠে।
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশঙ্কায়। আর আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।[270]
শুধু নামাজ আদায় নয়, রাতের শেষ ভাগে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা খাঁটি ঈমানদারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঈমানদারদের গুণাবলি সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, 'তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত ব্যয়কারী ও রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থী।[271]

---

270 সূরা: সাজদা, আয়াত: ১৬

271 সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৭

রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে অধিক নামায আদায় করতেন। কেননা এই সময়টি ছিল তাঁর ও তাঁর প্রতিপালকের একান্ত মুহুর্ত। এ কারণে তিনি রাতের নামাজ সম্পর্কে বলেন, أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل

** ফরয নামায গুলোর পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হলো রাতের নামায।[272]

তাহাজ্জুদ নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর শ্রেষ্ঠ নামাজ। মহানবী হজরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রমজানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ হলো রাতের তাহাজ্জুদের নামাজ।[273]

তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা প্রতিদিন রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব! কে আমার কাছে কিছু চাইবে, আমি তাকে দান করব! আর কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব।[274]

তাহাজ্জুদের নামায (সালাত): আল্লাহর পথে শ্রেষ্ঠ দাওয়া:

যেমন তাহাজ্জুদের সালাত, আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও দোয়া করুলের সর্বোত্তম মাধ্যম: আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْن

'আমি মানুষ এবং জিনকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।[275]

وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন আপনার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। আশা করা যায়, আপনার রব আপনাকে প্রশংসিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

---

272 সুনানে আবু দাউদ: ২৪২৯, মুসনাদে আহমাদ: ৮৪৮৮

273 মুসলিম, হাদিস নম্বর: ১১৬৩

274 বুখারি ও মুসলিম

275 সূরা জারিয়াত: ৬৫

তাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর ইবাদত করা একান্তই জরুরি। আল্লাহর ইবাদতের অন্যতম একটি ফরজ ইবাদত নামাজ। যার মাধ্যমে বান্দা তাঁর প্রভুর প্রিয় পাত্র হতে পারে।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, ফরজ নামাজের পর সকল সুন্নাত ও নফল নামাজের মধ্যে তাহাজ্জুদ নামাজের বরকত ও ফজিলত সবচেয়ে বেশি। যার মাধ্যমে বান্দা তাঁর প্রভুর আরো বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে। তাই রাসূল (স.) নিজে নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করার পাশাপাশি সাহাবিদের এ বিষয়ে তাগিদ দিতেন।

মুসলিম ও তিরমিজি শরীফের হাদীসে তাহাজ্জুত নামাজকে ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবু হোরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহ তাঁর বান্দার দোয়া কবুল করেন। রাসূল (স.) বলেছেন, প্রত্যেক রাতের এক-তৃতীয়াংশে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে বান্দাদেন উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের কে আছো, আমাকে ডাকবে! আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার কাছে কিছু চাইবে! আমি তাকে তা দেব, কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে! আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।[276]

তাহাজ্জুদ অর্থ- ঘুম থেকে জাগা এবং নামাজ অর্থ- প্রার্থনা করা। সুতরাং মধ্যরাতে ঘুমা থেকে জেগে প্রভুর সান্নিধ্যে একান্ত প্রার্থনা করাই মূলত তাহাজ্জুদ নামাজের উদ্দেশ্য। তাহাজ্জুদকে সালাতুল লাইল-ও বলা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আগে নবী করিম (স.)-এর উপর তাহাজ্জুদ আদায় ফরজ ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হলে

---

[276] মুসলিম ও মেশকাত (১০৯ পৃঃ) শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

এটি নফল ইবাদতে পরিণত হয়। তবে এ নামাজের বরকত ও ফজিলত অন্য সব সুন্নত ও নফল নামাজের চেয়ে অনেকগুণ বেশী।

রাতের শেষ অংশে তাহাজ্জুদ পড়া সর্বোত্তম:

তাহাজ্জুদ নামাজের সময় মূলত এশার নামাজের পর থেকেই শুরু হয়। তবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে এ নামাজ পড়া উত্তম। কিন্তু কারো মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠার সমস্যা থাকলে এশার নামাজের পর এবং বিতরের আগে দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়ে নেওয়া জায়েজ আছে। মূলত তাহাজ্জুদের মূল সময় রাত ২টা থেকে শুরু হয়ে সুবহ সাদিক তথা ফজরের আযানের আগ পর্যন্ত থাকে। এ সময়ে তাহাজ্জুদ আদায় করা সর্বোত্তম।

কুরআনে রাতের শেষ অংশে তাহাজ্জুদ পড়াকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা রাসূল (স.) কখনো মধ্যরাতে, কখনো তার কিছু আগে অথবা পরে ঘুম থেকে উঠতেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে-ইমরানের শেষ রুকুর কয়েক আয়াত পড়ার পর মেসওয়াক ও ওযু করে নামজ আদায় করতেন।

তাহাজ্জুদে সূরা-কেরাত দীর্ঘ করা উত্তম:

তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কেননা এ নামাজ একটি নফল ইবাদত। যা অন্য নামাজের মতোই দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়া যায়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে তাই করতেন। তিনি কখন ২ রাকাত, কখনো ৪ রাকাত, কিংবা কখনো ৮ রাকাত ও ১২ রাকাত এ নামাজ আদায় করতেন। কিন্তু কেউ যদি এ নামাজ ২ রাকাত আদায় করেন, তাহলেও তার তাহাজ্জুদ আদায় হবে। কেউ ১২ রাকাত আদায় করলে, তাও আদায় হয়ে যাবে।

বিভিন্ন বর্ণনা মতে, এ নামাজ ২ রাকাত থেকে ২০ রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এশার পর দুই বা ততোধিক রাকাত নামাজ পড়ে নেয়, সে হবে তাহাজ্জুদের ফজিলতের অধিকারী।'

যে কোনো সুরা দিয়েই এ নামাজ পড়া যায়। তবে রাসূল (স.) যথাসম্ভব বড় সূরা তিলাওয়াত করতেন। এমনকি রুকু ও সেজদাও দীর্ঘ করে একান্ত নিবিষ্ট মনে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। তাই লম্বা কেরাতে তাহাজ্জুদ আদায় করা উত্তম। কেরাত উঁচু বা নিচু উভয় আওয়াজে পড়া জায়েজ আছে। তবে কারও কষ্টের কারণ হলে চুপিচুপি পড়া কর্তব্য।

তাহাজ্জুদে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দোয়া:

বোখারি, মুসলিম ও মেশকাত শরীফের হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, গভীর রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে উঠে প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা আল-ইমরানের শেষ পর্যন্ত পড়তেন। তিনি মহান প্রভুর দরবারে বিনীত চিত্তে ফরিয়াদ করে বলতেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। পবিত্রতা তোমারই জন্য। আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।'

রাসূল (স.) বলতেন, 'হে প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর, তাকে অপমানিত কর। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনার জন্য একজন আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনে ঈমান এনেছি।'

তিনি প্রার্থনা করতেন, ‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদের সকল গোনাহ মাফ করে দাও। আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দাও। আর নেক লোকদের সঙ্গে আমাদের মৃত্যু দাও।’

পাপ মুক্তিতে তাহাজ্জুদ নামাজ:

পাপের কুলশতা মুক্ত হতে তাহাজ্জুদ নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। সকল পাপ মুক্তির জন্য গভীর রাতে পরম দয়ালু অসীম করুণাময় আল্লাহর নিকট সিজদায় অবনত হয়ে গভীর অনুশোচনায় তওবা করে ফরিয়াদ করলে, আল্লাহ বান্দার সকল পাপ মুছে দেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করে রহমতের হাত বাড়িয়ে দেন। তারাই আল্লাহ কাছে প্রিয় বান্দা।

সূরা আল ফুরকান-এর ৬৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন, ‘আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা, যারা তাদের রবের দরবারে সিজদা করে এবং দাঁড়িয়ে থেকেই রাত কাটিয়ে দেয়।’

হাদিসে তাহাজ্জুদ আদায়কারীর উপর আল্লাহর রহমাত বর্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ মর্মে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং সে তার স্ত্রীকেও ঘুম থেকে জাগিয়ে নামায পড়ায় এমনকি সে যদি জেগে না উঠে, তবে তার মুখে খানিকটা পানি ছিটিয়ে দেয়, তাহলে তার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করে থাকেন। অনুরুপ কোন মহিলা যদি রাত্রিকালে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে এবং সে তার স্বামীকে নামাযের জন্য জাগায়, এমনকি স্বামী না জাগলে স্ত্রী তার মুখে পানি ছিটিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়, তাহলে তার প্রতিও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে।[277]

[277] আবু দাউদ, নাসায়ী ও মেশকাত শরীফ (১০৯ পৃঃ)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুফর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজিত হওয়ার পেছনে মূল ভূমিকা ছিল তাহাজ্জুদ নামাজ। কেননা গভীর রাতে তাঁরা আল্লাহ তায়ালার দরবারে চোখের পানি ফেলে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পবিত্র কোরআনে সূরা আলে ইমরানে **১৭** আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তারা ছিল কঠিন পরীক্ষায় পরম ধৈর্যশীল, অটল-অবিচল, সত্যের অনুসারী, পরম অনুগত। আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ উৎসর্গকারী এবং রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর কাছে ভুলত্রুটির ক্ষমাপ্রার্থী।'

সুতরাং আল্লাহ প্রিয় বান্দা হয়ে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে তাহাজ্জুদ নামাজের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা তাহাজ্জুদ বান্দাকে তাঁর রবের প্রিয় পাত্রে পরিণত করে।

ইশরাক:

'ইশরাক' অর্থ হলো উদয় হওয়া বা আলোকিত হওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় ইশরাক হলো সূর্যোদয়ের পর যখন পূর্ণ কিরণ বিচ্ছুরিত হয়, সে সময়। এই সময়ের নামাজকে ইশরাক নামাজ বলা হয়। হযরত আনাস রাযি থেকে বর্ণিত,

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. (هذا حديث حسن غريب

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামায পড়বে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকবে, তারপর দু'রাকাত নামায পড়বে, তাহলে সে একটি হজ্ব ও একটি উমরার সওয়াব পাবে। এরপর তিনি তাকিদ করে বলেন, হ্যা পূর্ণ হজ্ব ও উমরার সওয়াব সে পাবে।[278]

[278] সুনানু তিরমিযি- ৫৮

ইমাম তিরমিযি রাহ উক্ত হাদীসকে হাসান বলেছেন। তাছাড়া হযরত জবির রাযি থেকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৈনন্দিন আদত বা অভ্যাস বর্ণিত রয়েছে, عن جابر بن سمرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس هذا حديث حسن صحيح রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত জায়নামাযেই বসে থাকতেন।[279] অর্থাৎ ইশরাকের জন্যই বসে থাকতেন।

এই হাদীস সমূহ দ্বারা ইশরাকের নামাযই উদ্দেশ্য। কেননা সূর্যোদয়ের দিনের প্রথমভাগে যে নামায পরা হয় সেটার নাম ইশরাক।

'রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন; এরপর সূর্য ওপরে উঠলে তিনি (ইশরাকের) নামায আদায় করতেন।[280]

এ নফল নামাজের ফযীলত বর্ণনায় একাধিক হাদিসে এসেছে- হজরত আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক নামাজের পর (ধারাবাহিক) আর এক নামাজ; যার মাঝখানে কোনো গোনাহ হয়নি, তা ইল্লিয়্যুন (উচ্চ মর্যাদায়) লেখা হয়।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামাআতের সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়ল। অতপর সূর্য উঠা পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর জিকির করল; অতপর দাঁড়িয়ে দুই রাকাআত নামাজ পড়ল; সে একটি হজ ও ওমরাহ করার সাওয়াব নিয়ে ফিরে গেল।[281]

---

279 সুনানু তিরমিযি- ৫৮-৫

280 আবু দাউদ: ১২৯৪

281 তাবারানি

মুফতি আমিমুল ইহসান (রা.)-এর মতে, সাধারণত সূর্যোদয়ের ২৩ মিনিট পর ইশরাকের ওয়াক্ত শুরু হয়। কারও মতে, সূর্যোদয়ের ২৫ বা ৩০ মিনিট পর থেকে এর সময় আরম্ভ হয়। শায়খ ইসাইমিনের মতে, সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পর ইশরাক

আরম্ভ হয়। আধুনিক গবেষণায় সূর্যোদয়ের পাঁচ থেকে আট মিনিট পরই ইশরাকের সময় হয়। সকাল নয়টা পর্যন্ত এই নামাজ আদায় করা যায়। মোটকথা সূর্যোদয়ের পর মাকরুহ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর যেকেনো মূহুর্তে ইশরাকের নামায পড়া যাবে। ইশরাকের নামাজের জন্য সুস্পষ্ট আলাদা কোনো সূরাহ ক্বিরাত নেই।

ইশরাকের নামায রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'রাকাত প্রমাণিত রয়েছে। এবং হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি থেকেও দু রা'কাতের এক বর্ণনা রয়েছে। তবে অন্য এক বর্ণনায় চার রা'কাতের কথাও এসেছে। যেমন হযরত আবু-দারদা এবং হযরত আবু যর রাযি থেকে বর্ণিত,

عن أبي الدرداء، وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره هذا حديث حسن غريب হে বনী আদম! আমার জন্য দিনের প্রথমাংশে চার রা'কাতের গুরুত্ব দাও, আমি দিনের শেষাংশ পর্যন্ত তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবো।[282]

চাশত:

'চাশত' অর্থ হলো দিনের দ্বিতীয় প্রহর, মধ্যাহ্ন-পূর্ব বা মধ্য-পূর্বাহ্ন। চাশত শব্দটি ফারসি, এর আরবি প্রতিশব্দ হলো দোহা বা জোহা; উচ্চারণে এটি দুহা বা জুহা হয়ে থাকে। কোরআনে এই (দোহা বা জোহা) নামে একটি সূরাও রয়েছে। যার শুরুতে বলা হয়েছে: শপথ পূর্বাহ্নের![283] এই সময়কে ওয়াজুজ জুহা বা চাশতের ওয়াক্ত বলা হয়।

---

[282] সুনানু তিরমিযি-৪৭৫

[283] আদ-দুহা: আয়াতঃ ১

চাশত নামাজ ৮ থেকে ১২ রাকাত পড়া ভালো; তবে চার রাকাত বা দুই রাকাত পড়লেও চাশত নামাজ বলেই গণ্য হবে।

মূলত চাশত, দুহা/যুহা একই নামাযের ভিন্ন নাম। অন্যান্য ফরয নামাযের পরে নফল নামায পড়ার জন্য সময় সীমিত থাকে। ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়। এই সময় বান্দা যাতে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না হতে পারে তাই এই নফল নামাযের ভূমিকা অনেক মর্ত্যবার অবকাশ রাখে।

ফরয নামাযের মত নির্দিষ্ট করে নফল নামাযের শুরু এবং শেষ সীমানাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ননা করেননি। তবে হযরত আলী রাযি থেকে এর সময় সীমা বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন,

عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار؟ فقال: إنكم لا تطيقون ذاك، فقلنا من أطاق ذاك منا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، والمرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين পূর্বদিগন্তে সূর্য যখন এ পরিমাণ উদয় হয়েছিলো, যতটুকু পশ্চিম দিগন্তে আসরের সময় থাকে, তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত নামায পড়তেন। এবং পূর্বদিগন্তে সূর্য যখন এ পরিমাণ উদয় হয়েছিলো, যতটুকু পশ্চিম দিগন্তে যোহরের সময় থাকে, তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাত নামায পড়তেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের ফরযের পূর্বে চার রা'কাত ও পরে দু'রাকাত এবং আছরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত পড়তেন। প্রত্যেক দু'রাকাতের পর ফিরিস্তার, আম্বিয়া, এবং পরবর্তী উম্মতের উপর সালাম তথা তাশাহুদ পড়তেন।[284]

[284] সুনানু তিরমিযি- ৫৯৮

এখানে প্রথম নামায দ্বারা ইশরাকের নামায উদ্দেশ্য আর দ্বিতীয় নামায দ্বারা চাশতের নামায উদ্দেশ্য। ইমাম গাযযালী রাহ, বলেন, ইশরাকের নামায ঐ সময় পড়া হবে, যখন সূর্য এক নে'যা পরিমাণ উচুতে উঠবে।আর দিনের এক চতুর্থাংশ চলে যাবার পর চাশতের নামায পড়া হবে।[285]

সূর্যোদয় এবং যাওয়ালের ঠিক মধ্যবর্তী সময়-ই চাশতের নামাযের জন্য উত্তম।

সালাতুদ-দোহা/ চাশতের নামাযের ফযিলতঃ

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি থেকে বর্ণিত,

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চাশতের ১২রা'কাত নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের একটি প্রসাদ নির্মাণ করে দেবেন।[286]

সালাতুদ-দোহা/চাশতের নামাযের সময়ঃ

চাশতের নামায যা ফুকাহায়ে কেরামদের নিকট সালাতুয-যুহা নামে পরিচিত, এ নামাযের সময়সূচী সম্পর্কে দুররুল মুখতারে বর্ণিত আছে,

نُدِبَ أَرْبَعٌ فَصَاعِدًا فِي الضُّحَى عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ بَعْدِ الطُّلُوعِ إلَى الزَّوَالِ وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ بَعْدَ رُبُعِ النَّهَارِ وَفِي الْمُنْيَةِ أَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرُهَا اثْنَيْ عَشَرَ، وَأَوْسَطُهَا ثَمَان ভাবার্থঃ বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী চার রাকাত বা তার চেয়ে বেশী সালাতুয-যুহা (চাশতের নামায) পড়া মুস্তাহাব।সূর্যোদয়ের পর থেকে নিয়ে যাওয়ালে সূর্য বা মাথার উপর থেকে সূর্য পশ্চিমদিকে হেলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময়ে ভিতর। উত্তম হচ্ছে দিনের এক চতুর্থাংশ

---

[285] এহইয়াউল উলূম-১/১৯৭

[286] সুনানু তিরমিযি-৪৭৩

চলে যাবার পর পড়া। মুনয়া কিতাবে বর্ণিত আছে- সর্বনিম্ন ২রাকাত ও সর্বোচ্ছ **১২** রাকাত এবং মধ্যম হচ্ছে ৮ রাকাত।[287] ২থেকে **১২** রাকাত যে কোনোটা পড়া যাবে।[288]

সালাতুদ-দোহা/চাশতের নামাযের রা'কাত সংখ্যাঃ

হযরত উম্মে হানি রাযি থেকে বর্ণিত,

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل، فسبح ثمان ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন উনার ঘরে প্রবেশ করেন, অতঃপর গোসল করেন, তারপর আট রাকাত চাশতের নামায পড়েন।আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এত তারাতারি নামায পড়তে কখনো দেখিনি।তবে রুকু সেজদা ভালোভাবে করেছেন।[289]

তবে সাধারণত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা চার রাকাতই চাশতের নামায পড়তেন। যেমন হযরত আয়েশা রাযি থেকে বর্ণিত রয়েছে, عن معاذة، أنها سألت عائشة رضي الله عنها، كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء

হযরত আয়েশা রাযি কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাশতের নামাযের সংখ্যা নিয়ে জিজ্ঞাসা হলে তিনি জবাবে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাধারণত চার রা'কাত চাশতের নামায পড়তেন।তবে কখনো কখনো এর চেয়েও বেশী পড়তেন।[290]

---

[287] দুররুল মুখতার-২/২২

[288] ফাতাওয়া রহিমিয়্যাহ-৪/৮৩। কিতাবুল-ফাতাওয়া-২/৩৬৩

[289] সুনানু তিরমিযি-৪৭৪

[290] সহীহ মুসলিম-৭১৯

জাওয়াল:

'জাওয়াল' অর্থ হলো স্থানান্তর, স্থানচ্যুতি, পরিবর্তন, আবর্তন, সরে যাওয়া ও হেলে যাওয়া ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় জাওয়াল হলো দিনের তৃতীয় প্রহরের প্রারম্ভ, মধ্যাহ্নোত্তর, অপরাহ্নের সূচনা সময়; দিনের মধ্যভাগে বা দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে যায়। এই সময়কে ওয়াজুজ জাওয়াল বলা হয়। এটি মূলত মধ্যদিনের সিজদা ও নামাজ নিষিদ্ধ সময়ের পর জোহরের ওয়াক্তের সূচনাপর্ব। এ সময় যে নফল নামাজ আদায় করা হয়, তাকে জাওয়ালের নামাজ বলা হয়।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা সূর্য ঢলে পড়ার পর চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি সদা সূর্য হেলে পড়লে চার রাকাত নামাজ কেন আদায় করেন? তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সূর্য ঢলে পড়লে আসমানের দরজা খোলা হয়, এরপর জোহর নামাজ পর্যন্ত তা বন্ধ করা হয় না। আমি চাই, ওই সময়ে আমার কোনো নেক আমল ওপরে যাক।[291]
জাওয়াল নামাজ চার রাকাত, দুই রাকাত পড়লেও তা নামাজরূপে পরিগণিত হয়।

আউওয়াবিন:

'আউওয়াবিন' আরবি শব্দ। এটি বহুবচন; অর্থ হলো প্রত্যাবর্তনকারীরা। কর্মবাচ্য বা কর্মকারক ও সম্বন্ধ পদ হিসেবে হয়
'আউওয়াবিন', কর্তাবাচক ও কর্তৃকারক হিসেবে মূল রূপ হলো 'আউওয়াবুন'। এর একবচন হলো আউওয়াব, যার মানে

291 ইবনু মাজাহ: ১১৫

হলো প্রত্যাবর্তনকারী। যিনি আল্লাহর দিকে বেশি বেশি ফিরে আসেন, গুনাহ থেকে বেশি পরিমাণে তওবা করেন।

'আউওয়াব' শব্দটি পবিত্র কোরআনে চারবার এসেছে। 'আউওয়াব' শব্দের আরেকটি অর্থ হলো 'অত্যধিক অনুগত',

যিনি একান্তে গোপনে নির্জনে নিজের পাপ স্মরণ করে তার জন্য তওবা করে আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে

ফিরে যান। 'আউওয়াব' শব্দটি 'মুসাব্বিহ' বা তাসবিহ পাঠকারী তথা পবিত্রতা বর্ণনাকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কখনো এটি

'দৃঢ় সংকল্প' ও 'অবিচল' অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার 'সন্ধ্যা সমীরণ' অর্থেও এর ব্যবহার রয়েছে। আরবদের মধ্যে

'আবাতিশ শামস' কথাটি 'গাবাতিশ শামস' অর্থে ব্যবহৃত হয়; 'গারাবাতিশ শামস' মানে সূর্য অস্তমিত হলো বা সূর্য অস্ত গেল।

শরিয়তের পরিভাষায় 'আউওয়াবিন নামাজ' হলো মাগরিবের নামাজর পর এশার নামাজের আগে আদায় করা নামাজ। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর ছয় রাকাত নামাজ আদায় করবে; এসবের মাঝে কোনো মন্দ কথা না বলে, তার এই নামাজ ১২ বছরের ইবাদতের সমতুল্য গণ্য হবে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর ২০ রাকাত নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।[292]

'রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়তেন এবং তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়বে, তার সব

---

292 তিরমিজি, মিশকাত; ১০৩-১০৪; ফয়জুল কালাম, পৃষ্ঠা: ৩২০-৩২১, হাদিস: ৪৪৯-৪৫০

গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে; যদি তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণও হয়।' হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই নামাজকে আউওয়াবিন নামে অভিহিত করেছেন।

ইমাম তীবি (রা.)-এর মতে, মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নতও এই ছয় রাকাতের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট রাকাতগুলো এক নিয়তে দুই বা চার রাকাত করে পড়া যায়। কিছু ওলামায়ে কেরামের মতে ফরজের পরই আওয়াবিনের সময় শুরু হয়। অতএব, দুই রাকাত সুন্নতসহ সর্বমোট ছয় রাকাত পড়ার দ্বারা আওয়াবিন পড়ার সওয়াব অবশ্যই পেয়ে যাবে। তবে দুই রাকাত সুন্নত পড়ার পর ছয় রাকাত আওয়াবিন পড়াই শ্রেয়। আওয়াবিন নামাজে পড়ার বিশেষ কোনো সুরা নেই।[293]

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ৬ রাকাত[294] কখনো ৪ রাকাত (নাইলুল আওতার) কখনো ১২ রাকাত[295] আবার কখনো বা ২০ রাকাত[296] নফল নামাজ পড়তেন। তবে ৬ রাকাতই অধিকাংশ সময় পড়তেন।

অউয়াবিন নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন নামাজি মাগরিবের নামাজ পড়ে শেষ করে এবং এর ওয়াক্ত ইশার ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত থাকে।[297] অর্থাৎ মাগরিবের পর সর্বোচ্চ ২০ রাকাত ও সর্বনিম্ন দুই রাকাত পড়ার কথা বর্ণিত আছে; চার রাকাত এবং ছয় রাকাতের বর্ণনাও পাওয়া যায়। যার পক্ষে যখন যা সম্ভব, তিনি তা-ই পড়বেন।

---

293 মাজমাউল আনহুর ১/১৯৫, তিরমিজি, হাদিস: ৪৩৫, ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত: ৩/১৫৫

294 তিরমিজি

295 ইতহাফুস সাদাহ: ৩/৩৭১

296 তিরমিজি: ৪৩৫

297 মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা।

সালাত আল-ইস্তিখারা:

(আরবি: صلاة الاستخارة), যেটি পরামর্শ খোঁজার প্রার্থনা হিসাবে অনুবাদ করা হয়, মুসলিমদের দ্বারা পাঠ করা একটি প্রার্থনা যারা তাদের জীবনের সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হওয়ার সময় ঈশ্বর থেকে নির্দেশনা চান। ইস্তেখারা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, কোন জিনিসের ক্ষেত্রে কল্যাণ কামনা করা অর্থাৎ আপনার যদি কোন কাজ করার ইচ্ছা হয় কাজটি আপনার জন্য কল্যাণকর নাকি বিপদজনক এ বিষয়ে আল্লাহর কাছ থেকে পরামর্শ তলব করা। সালাতুল ইস্তেখারা হলো, আল্লাহর নিকট কোন জিনিসের ক্ষেত্রে কল্যাণ কামনা করা। কোন কিছু নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা থাকলে এই নামাজ পড়া হয়। এই নামাজ খুব নিয়ামতপুর্ণ ।

আরবীতে সালাহ নামে পরিচিত নামাযটি নামাজের দুটি একক বা রাকাত এর পরে সালাত আল-ইস্তিখারা-এর দোয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই নামাজটির নিয়ম হলো, দুই রাকাত নামাজ পড়বে তারপর নামাজ শেষে আল্লাহর প্রশংসা করবে অর্থাৎ আল্লাহর হামদ পড়বে তারপর রাসুলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরূদ পড়বে। তারপর একটি দোয়া পড়বে যেটা নিম্নে দেওয়া হয়েছে। এটি ভাগ্য গণনাকাররী তীর এর একটি অনুমোদিত বিকল্প হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল, যা ইসলামে অবৈধ এবং প্রাক-ইসলামী আরবে প্রচলিত ছিল।

গুরুত্ব:

নিজের জীবনে, একজন ব্যক্তির অজানা ফলাফল সহ অনেক বিষয়ে উন্মোচিত হয়, এবং সে অজানা পরিণতি সহ বিষয়গুলি গ্রহণ করে, সেগুলি ভাল বা খারাপ কিনা, তার এই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত কি না। তাই আল্লাহ ইস্তেখারা নামাযকে দ্বিধার চিকিৎসা এবং সমস্যার সমাধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন যাতে দ্বিধা স্থিরতা এবং সন্দেহ নিশ্চিততায় পরিণত হয়, ফলে সে আশ্বস্ত ও শান্ত হয়, আল্লাহ তার জন্য যা

নির্ধারণ করেছেন তাতে সন্তুষ্ট হন, যদিও তা মন্দ হয়। চেহারায়, কারণ সে তার প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তার উপর ভরসা করেছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের শেখাতে আগ্রহী ছিলেন যদি তাদের মধ্যে কেউ কোন বিষয়ে চিন্তা করেন, যদি তিনি তা করার ইচ্ছা করেন বা করার সিদ্ধান্ত নেন তবে তিনি জানেন না। এটা তার জন্য ভালো হোক বা বাস্তবে না হোক, কিন্তু চেহারায় সে এটাকে তার স্বার্থে দেখে।

হুকুম:

ওলামায়ে কেরাম একমত যে, ইস্তিখারার নামাজ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তার দলীল নিম্নের বোখারীর হাদীস

عَنْ جَابِرٍ وعن سعد بن أبي وقاص صحيح البخاري, أن النبي قال:من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة بني آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. حديث صحيح, জাবিরের সূত্রে এবং সহীহ আল-বুখারিতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের সূত্রে, নবী (সা) বলেছেন: আদম সন্তানের সুখের একটি অংশ আল্লাহর পরামর্শ চাওয়া, আদম সন্তানের সুখের একটি অংশ হল আল্লাহ তাকে যা আদেশ করেছেন তাতে সন্তুষ্টি। আদম সন্তানের দুঃখের একটি অংশ হল ঈশ্বরের পরামর্শ চাইতে তার অবহেলা, এবং আদম সন্তানের দুঃখের একটি অংশ হল ঈশ্বর যা আদেশ করেছেন তার প্রতি তার অসন্তুষ্টি। সহীহ হাদীস

নামাজের বর্ণনা:

সালাত আল-ইস্তিখারার বর্ণনা যা "পরামর্শ অন্বেষণের প্রার্থনা"-তে অনুবাদ করে ইসলামের সুপরিচিত শিষ্য, জাবির ইবনে আবদ-আল্লাহ আল--সালামি এর দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। , যিনি বলেছেন:[১]

আল্লাহর রসূল তাঁর সাহাবীদেরকে সব বিষয়ে আল্লাহর কাছ থেকে পরামর্শ (ইস্তিখারা) চাইতে শেখাতেন, যেমন তিনি তাদেরকে কোরআন থেকে অধ্যায় শেখাতেন। সে বলেছিল: তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তিত হয় বা কোনো পদক্ষেপ নিতে চায় তাহলে সে যেন দুই ওয়াক্ত নামায পড়ে।

হে আল্লাহ, আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে আপনার পরামর্শ চাই এবং আমি আপনার শক্তির মাধ্যমে আপনার সাহায্য চাই এবং আমি আপনার অপার অনুগ্রহের জন্য আপনার কাছে চাই, কারণ আমি না থাকলেও আপনিই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন এবং আমি না থাকলেও আপনিই জানেন এবং আপনি একা অদৃশ্যের সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী। হে আল্লাহ, যদি আপনি এই বিষয়টি (এখানে উল্লেখ করুন) আমার দ্বীন, আমার জীবন ও জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণাম, আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আমার জন্য কল্যাণকর বলে জানেন, তাহলে আমার জন্য এটি নির্ধারণ করুন এবং আমার জন্য এটি সহজ করুন। অতঃপর এর মধ্যে আমার জন্য বরকত স্থাপন করুন, এবং যদি আপনি জানেন যে এই ব্যাপারটি আমার জন্য আমার দ্বীন, আমার জীবন ও জীবিকা এবং আমার বিষয়ের শেষের জন্য ক্ষতিকর, তবে এটিকে আমার থেকে সরিয়ে দিন এবং আমাকে তা থেকে সরিয়ে দিন এবং এর জন্য আদেশ দিন। আমার কাছে যা ভালো, তা যেখানেই থাকুক এবং আমাকে তাতে সন্তুষ্ট কর।

আরেকটি অনুবাদ নিম্নরূপ:

হে আল্লাহ, আমি আপনার জ্ঞানের ভিত্তিতে [একটি পছন্দ করার জন্য] আপনার দিকনির্দেশনা চাই, এবং আমি আপনার ক্ষমতার গুণে সামর্থ্য চাই এবং আমি আপনার মহান অনুগ্রহ চাই। তোমার ক্ষমতা আছে, আমার নেই। এবং আপনি জানেন, আমি জানি না. আপনি গোপন বিষয়ের জ্ঞাত। হে আল্লাহ, যদি আপনার জানামতে, এই বিষয়টি (তাহলে নাম উল্লেখ করা উচিত) আমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয়

ক্ষেত্রেই কল্যাণকর হয়, তাহলে আমার জন্য এটি নির্ধারণ করুন, আমার জন্য এটি সহজ করুন এবং আমার জন্য এতে বরকত দিন। আর যদি আপনার জানামতে তা আমার জন্য এবং আমার ধর্মের জন্য, আমার জীবিকা ও আমার বিষয়ের (অথবা: আমার জন্য এই দুনিয়া এবং পরকাল উভয়ের জন্য) খারাপ হয়, তবে আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দিন, [এবং আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিন], এবং যেখানেই থাকুক না কেন আমার জন্য কল্যাণের নির্দেশ দিন এবং আমাকে তাতে সন্তুষ্ট করুন।

ইস্তেখারার দোয়া:

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) আমাদেরকে আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে ইস্তিখারা পড়ার নিয়ম এরুপ গুরুত্বসহকারে শিক্ষা দিতেন যেরুপ গুরুত্ব সহকারে আমাদেরকে কুরআন মজীদের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেহ কোন কাজ করার ইচ্ছা করে (আর সে উহার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তিত হয়, তখন তাহার এইভাবে ইস্তেখারা করা উচিত যে,) সে প্রথমে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে, এরপর এইভাবে দোয়া করবে –

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ ثم تسميه بعينه خَيْرا لِي في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قال أو فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لي وَيَسِّرْهُ لي ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ ، اللهم وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّه شَرٌّ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ في عَاجِلِ أمري وَآجِلِهِ ، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ [واصْرِفْهُ عَنِّى]، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رضِّنِي

به،

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি আপনার শক্তির সাহায্যে শক্তি ও আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা আপনিই ক্ষমতা রাখেন; আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি জ্ঞান রাখেন, আমার জ্ঞান নেই এবং আপনি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ (নিজের প্রয়োজনের নামোল্লেখ করবে) আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য কিংবা বলবে আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরিণামে কল্যাণকর হলে আপনি তা

আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন। সেটা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং তাতে বরকত দিন। হে আল্লাহ্! আর যদি আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরিণামে কিংবা বলবে, আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণকর হয়, তবে আপনি আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে দিন এবং সেটাকেও আমার থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আমার জন্য সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ নির্ধারণ করে রাখুন এবং আমাকে সেটার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিন।[298]

ইবনে হাজার হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন:

استخارة (ইস্তিখারা) শব্দটি اسم বা বিশেষ্য। আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তিখারা করা মানে কোন একটি বিষয় বাছাই করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তিকে দুটো বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় বাছাই করে নিতে হবে, সে যেন ভালটিকে বাছাই করে নিতে পারে সে প্রার্থনা।

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সর্ববিষয়ে ইস্তিখারা করা শিক্ষা দিতেন" : ইবনে আবু জামরা বলেন, এটি এমন একটি আম (সাধারণ); যার থেকে কিছু একককে খাস (বিশেষায়িত) করা হয়েছে। কেননা ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কর্ম পালন করার ক্ষেত্রে এবং হারাম ও মাকরূহ বিষয় বর্জন করার ক্ষেত্রে ইস্তিখারা করা যাবে না। তাই ইস্তিখারার গণ্ডি সীমাবদ্ধ শুধু মুবাহ বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং এমন মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে যে মুস্তাহাব অপর একটি মুস্তাহাবের সাথে সাংঘর্ষিক; সুতরাং দুইটির কোনটা আগে পালন করবে কিংবা কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা পালন করবে সেক্ষেত্রে। আমি বলব: এ সাধারণটি বড় ছোট সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ অনেক ছোটখাট বিষয়ের উপর অনেক বড় বিষয়ও নির্ভর করে থাকে।

---

298 সহিহ বুখারী (৬৮৪১) এ হাদিসটির আরও কিছু রেওয়ায়েত তিরমিযি, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে রয়েছে

ইবনে আবু জামরা বলেন, ইস্তিখারার দোয়ার আগে নামায পড়ার রহস্য হল, ইস্তিখারার উদ্দেশ্য হচ্ছে একসাথে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করা। আর এটি পেতে হলে রাজাধিরাজের দরজায় নক করা প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর স্তুতি জ্ঞাপন ও তাঁর কাছে ধর্ণা দেয়ার ক্ষেত্রে নামাযের চেয়ে কার্যকর ও সফল আর কিছু নেই।

اللهم إني أستخيرك بعلمك এখানে ب হরফটি করণাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার আলোকে অর্থ হবে, 'আমি আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি; যেহেতু আপনি অধিক জ্ঞানী'। এবং بقدرتك এর মধ্যেও ب হরফটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (সেক্ষেত্রে অর্থ হবে, আমি আপনার কাছে শক্তি প্রার্থনা করছি; কারণ আপনি ক্ষমতাবান।) আবার ب হরফটি استعانة বা সাহায্য অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। (সে ক্ষেত্রে অর্থ হবে 'হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি'। দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হবে, 'আমি আপনার শক্তির সাহায্যে শক্তি প্রার্থনা করছি'।)

(أستقدرك) অর্থ হচ্ছে, উদ্দেশ্য হাছিলে আমি আপনার কাছে শক্তি প্রার্থনা করছি। আরেকটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে, সেটা হচ্ছে- আমি আপানার কাছে প্রার্থনা করছি- আপনি আমার তাকদীরে সেটা রাখুন। উদ্দেশ্য হচ্ছে- আপনি আমার জন্য সেটা সহজ করে দিন।

(وأسألك من فضلك) (অর্থ- আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি)। এ বাক্যের মধ্যে এদিকে ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র দান হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। তাঁর নেয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাঁর উপর কারো কোন অধিকার নেই। এটাই আহলে সুন্নাহ্‌র অভিমত।

(فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم) (অর্থ- কেননা আপনিই ক্ষমতা রাখেন; আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি জ্ঞান রাখেন, আমার জ্ঞান নেই): এ কথার দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, জ্ঞান ও ক্ষমতা এককভাবে আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ্‌ বান্দার জন্য যতটুকু তাকদীর বা নির্ধারণ করে রেখেছেন এর বাইরে বান্দার কোন জ্ঞান বা ক্ষমতা নেই।

(اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر) (অর্থ, হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 'নিজের প্রয়োজনের নামোল্লেখ করবে'): ভাবপ্রকাশের বাহ্যিক শৈলী থেকে বুঝা যাচ্ছে প্রয়োজনটি উচ্চারণ করবে। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, দোয়া করার সময় মনে করলেও চলবে।

(..فاقدره لي) (অর্থ- আপনি তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন): অর্থাৎ আমার জন্য সেটা বাস্তবায়ন করে দিন। কিংবা অর্থ হবে আমার জন্য সেটা সহজ করে দিন।

(فاصرفه عني واصرفني عنه) (অর্থ, তবে আপনি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নিন এবং আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন): অর্থাৎ সে বিষয়টি ফিরিয়ে নেয়ার পরে আপনার অন্তর যেন সেটার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে না থাকে।

(...رضِّني) (অর্থ আমাকে তাতে সন্তুষ্ট রাখুন)। যেন আমি সেটা না পাওয়াতে ও না ঘটাতে অনুতপ্ত না হই। কেননা আমি তো চূড়ান্ত পরিণতি জানি না। যদিও আমি প্রার্থনাকালে সেটার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম...।

এ দোয়ার গূঢ় রহস্য হচ্ছে যাতে করে বান্দার অন্তর সেই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে না থাকে; পরিণতিতে সে মানসিক অস্বস্তিতে ভুগবে। সন্তুষ্টি বলতে বুঝায় তাকদীরের উপর অন্তরের স্বস্তি পাওয়া।

নামাযের শর্ত:

কোনো বিষয়ে পরামর্শ চাওয়ার ক্ষেত্রে ইস্তিখারা সালাত আদায় করা হয়, যেখানে হয় কাজটি নিজের জন্য যোগ্য বা ব্যক্তিটি কর্মের যোগ্য, যেমন জয়নাব বিনতে জাহশ নবী মুহাম্মদ সা: এর বিবাহের প্রস্তাবে ইস্তিখারা প্রার্থনা করেছিলেন, পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি নিজেকে নবীর জন্য যোগ্য কিনা তা খুঁজে বের করতে।

একজনকে অবশ্যই "সালাত আল-ইস্তিখারাহ" এর আগে ওজু করতে হবে, একইভাবে, যেভাবে একজন করে, যে কোনো সালাহ মধ্যে প্রবেশ করার সময়।

ইবনে হাজার এই হাদিসটির উপর মন্তব্য করে বলেন: "ইস্তিখারাহ হল একটি শব্দ যার অর্থ হল একজনকে বেছে নিতে সাহায্য করার জন্য আল্লাহর কাছে অনুরোধ করা, যার অর্থ হল দুটি জিনিসের মধ্যে সেরাটি বেছে নেওয়া যেখানে একজনকে তাদের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে।"

সালাহ ইস্তিখারা তখন করা হয় যখন কোন ফরয বা নিষিদ্ধ (হারাম) কোন বিষয়ের বাইরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাই হজ্জে যেতে হবে কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ সে যদি আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম হয় তাহলে হজ ফরজ এবং তার কোনো বিকল্প নেই।

কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া ("ইস্তিখারা") অন্য সব ধরনের অনুমতিযোগ্য বিষয়ে করা যেতে পারে যেখানে একটি পছন্দ করতে হবে যেমন কিছু কেনা, চাকরি নেওয়া, বা জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা ইত্যাদি।

হাদিসে লিপিবদ্ধ আছে যে মুহাম্মদ তার শিষ্যদেরকে প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর কাছ থেকে পরামর্শ নিতে ('ইস্তিখারা') শেখাতেন যেমন তিনি তাদের কুরআন থেকে সূরা শিখাতেন।[৩]

পণ্ডিতগণ বলেন, ইস্তিখারা ছালাত ফরজ ছালাতের বাইরে দুই রাকাত নামাজের যে কোনো একটি, তা হয় সুন্নত বা নফল, এবং ঋতুস্রাবের সময় মহিলারা নামায ছাড়াই দুআ করতে পারে এবং জরুরী পরিস্থিতিতে হারাম সময়েও এই সালাত আদায় করতে পারে।

ইস্তেখারার শর্ত:

নিয়্যাত করা।(মনে মনে)

প্রয়োজনীয় সকল চেষ্টা করা। অর্থাৎ ওয়াসিলা গ্রহণ করা।

আল্লাহর হুকুমে খুশী থাকা শুধুমাত্র হালাল কিংবা বৈধ বিষয়ে ইস্তেখারা করা।

তাওবা করা, অন্যায় করে কিছু গ্রহণ না করা, হারাম উপার্জন না করা, হারাম মাল ভক্ষণ না করা।

যে সব বিষয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে অর্থাৎ বিষয়টি তার ইচ্ছার অধীনে সেসব বিষয়ে ইস্তেখারা না করা।

ইস্তেখারা স্বপ্নে নয়:

অধিকাংশ মানুষ এটা ধারণা করে যে, ইস্তেখারার নামাজের পর তাকে স্বপ্ন দেখানো হবে এবং সে সঠিকপথ নির্দেশিত হবে। এটি একটি প্রচলিত ভুল। তার উচিত হবে কোন একটি সিদ্ধান্তকে অগ্রগণ্য করে তারপর বিষয়টিকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করা। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন তোমরা কোন বিষয়ে দৃঢ় ইচ্ছা করবে তখন আল্লাহর

উপর নির্ভর করবে। অতএব এরপর কোন বিষয় যদি তিনি সহজ করে দেন তাহলে সেটা ঠিক আছে আর যদি তা না হয় তাহলে এটা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

কুরআনের দ্বারা ইস্তিখারা:

কিছু লোক কুরআন থেকে অশুভ গ্রহণ করে কুরআনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। যদি তারা এমন একটি আয়াত খুঁজে পায় যা কিছু করার আদেশ দেয় তবে তারা তা করে, যেমন ভ্রমণ বা বিয়ে করা। যদি তারা এমন একটি আয়াত খুঁজে পায় যা কিছু করতে নিষেধ করে, তারা কাজটি ছেড়ে দেয় এবং বুঝতে পারে যে এটি নিষিদ্ধ ছিল। মুহাম্মাদ আল-খিদর হুসেন তার বই (কোরআনের বাগ্মীতা) এ উল্লেখ করেছেন যে কিছু ঐতিহাসিক বলেছেন যে কিছু পন্ডিত সমুদ্রপথে ভ্রমণ করতে চেয়েছিলেন, তাই তারা কুরআন খুলেছিলেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণীর কাছে এসেছিলেন: এবং সমুদ্রকে ছেড়ে দিন বিশ্রাম। নিঃসন্দেহে তারা একটি নিমজ্জিত বাহিনী।[299] সুতরাং তারা যাত্রা ছেড়ে দিল এবং জাহাজটি তার যাত্রীদের নিয়ে সমুদ্রে ডুবে গেল। এটি ঘটনাক্রমে ঘটেছিল, এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ কুরআন নাজিল করেননি এটি থেকে অশুভ নেওয়ার জন্য, বরং তিনি এটিকে অন্তরে যা আছে তার নিরাময় হিসাবে নাজিল করেছেন।

কিছু লোক অন্যভাবে কুরআন থেকে নির্দেশনা খোঁজে, তা হল কুরআন নিয়ে এর একটি এলোমেলো পৃষ্ঠা খুলুন, তারপর প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম লাইনটি দেখুন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাতটি পৃষ্ঠা গণনা করে, তারপর সাতটি লাইন, তারপর সাতটি শব্দ, তারপর পড়ে। যদি তারা এমন একটি আয়াত খুঁজে পায় যা কিছু করার আদেশ দেয়, তারা তা করে। যদি তারা এমন একটি আয়াত খুঁজে পায় যা কিছু করতে নিষেধ করে

---

[299] আদ-দুখান: ২৪

তবে তারা তা ছেড়ে দেয়। ইসলামী আইনে এই ইস্তিখারার কোন ভিত্তি নেই এবং কোন ইমাম বা আলেমদের কাছ থেকে প্রেরিত হয়নি। এটি কাকতালীয় এবং ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে। কোরান একটি পথনির্দেশক গ্রন্থ হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছিল, যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি।

নবী মুহাম্মদ ইস্তিখারা সালাত এবং এর প্রার্থনা নির্ধারণ করেছেন এবং একজন মুসলমানের জন্য এই সরল পথ ব্যতীত অন্য কিছু অবলম্বন করা নিষিদ্ধ, যেমন উন্নত উদ্ভাবনের মাধ্যমে ইস্তিখারা অবলম্বন করা, যা আল্লাহর কিতাবের প্রতি কোন সম্মান রাখে না। তার জন্য জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বাণীর শরণাপন্ন হওয়া হারাম এবং অন্য কাউকে তার জন্য হেদায়েত চাইতে বলা এবং ইস্তিখারার সহজ ও বৈধ সুন্নাত নিজে পরিত্যাগ করা তার জন্য অনমনীয়।

ইস্তিখারা হল এক প্রকার ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার অনুশীলন যা প্রাচীন বিশ্বে পরিচিত, এবং গবেষকরা এটিকে স্বপ্নের ইনকিউবেশন নামক একটি আচারের সাথে তুলনা করেন যা প্রাচীন ইয়েমেনে প্রচলিত ছিল এবং যা একটি মিহরাব নামক একটি ঘরে অনুষ্ঠিত হয়।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

ইস্তিশারা:

ইস্তিখারা পূরণের জন্য যোগ্য জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে ইস্তিশারা বা পরামর্শ প্রয়োজন। ইস্তিশারা ইস্তিখারার আগে বা পরে করা যায়, তবে ইস্তিশারার আগে ইস্তিখারা নামায

পড়া হাদিস অনুসারে সর্বোত্তম ও পছন্দনীয়। আল-নওয়াবী বলেছেন: সালাত ইস্তিখারা করার আগে ইস্তেশারা বা পরামর্শ করা বাঞ্ছনীয় যে, এমন একজনের সাথে পরামর্শ করা, যিনি তার পরামর্শ, সহানুভূতি এবং অভিজ্ঞতার জন্য পরিচিত এবং যার ধর্ম ও জ্ঞান একজন বিশ্বাস করেন। শাইখ আল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন: সালাত ইলাস্তেখারা যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে হেদায়েত চায়, তার সৃষ্টির সাথে পরামর্শ করে এবং তার ব্যাপারে অবিচল থাকে সে কখনোই অনুশোচনা করবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন: {সুতরাং আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে আপনি তাদের প্রতি নমনীয় হন। আর তুমি যদি অভদ্র এবং হৃদয়ে রূঢ় হতে, তবে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। সুতরাং তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত নিবে তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা [তার ওপর] ভরসা করে। কাতাদা বলেছেন: সালাতে ইলাস্তাকরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন লোক একসাথে পরামর্শ করে না, তবে তারা সবচেয়ে সঠিক বিষয়ে পরিচালিত হয়। সালাত আলইস্তেখারার প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার পর ইস্তিখারা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের মধ্যে রয়েছে ইস্তিশারা বা পরামর্শ।

শেখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন বলেন এবং এই মতের সাথে একমত নন: সালাত ইলাস্তাখারা তার উক্তিতে: "ইস্তিখারা প্রথমে আসে, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যদি তোমাদের কেউ কিছু করার চিন্তা করে, তবে সে যেন দুই রাকাত নামায পড়ে...' ইত্যাদি। " অতঃপর যদি তুমি তিনবার তা পুনরাবৃত্তি কর এবং বিষয়টি তোমার কাছে পরিষ্কার না হয়, তাহলে পরামর্শ কর এবং তারপর যা তোমাকে উপদেশ দেওয়া হয়, তা করো। আমরা শুধু বলেছিলাম যে, সে যেন তিনবার হেদায়েত চায়, কারণ এটা ছিল নবীর রীতি, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁকে শান্তি দান করুন, তিনি যখন দুআ করেন তখন তিনি তিনবার দুআ

করেন। কিছু পণ্ডিত বলেছেন যে যতক্ষণ না ব্যক্তি তার কাছে দুটি বিষয়ের মধ্যে উত্তম বিষয়টি পরিষ্কার না করে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযের পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

নামাজের পুনরাবৃত্তি:

যতক্ষণ কর্ম সম্পর্কে তার সন্দেহ দূর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ এই ছালাত আদায় করতে পারে। পণ্ডিতরা পরামর্শ দেন যে সাত বার বা সাত দিন নামায পড়ার বর্ণনা দুর্বল, তাই সন্দেহের ক্ষেত্রে নামায পড়ার সংখ্যা সীমিত নয়, কারণ খলিফা উমর এক মাস ইস্তিখারা করেছিলেন কুরআন সংকলনের আগে কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে এটি একটি বিদাত হবে কারণ নবী মুহাম্মদ এটি নিজেও করেননি বা করার আদেশও দেননি। কিন্তু একমাস ইস্তিখারা করার পর তিনি নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে আশ্বস্ত ও দৃঢ়প্রত্যয়ী হন। এছাড়াও কথিত আছে, খলিফা ওমর বিন খাত্তাব ৫০০ হাদীস নিয়ে হাদীস সংকলন রচনা করেন ও একমাস ইস্তেখারা করার পর এর ফল ভালো হবে না (সম্ভবত কোরআনের সাথে মিশে যাওয়ার আশঙ্কায়) ভেবে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেন।

ফলাফলের চিহ্ন:

ইস্তিখারার ফলাফলের দুটি লক্ষণ রয়েছে

হৃদয় নেতিবাচক বা ইতিবাচক, কর্মের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে।

যদি পরিস্থিতি সহজ হয় তবে তা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইতিবাচকতার চিহ্ন, আর যদি পরিস্থিতি কঠিন বা কঠিন হয় তবে তা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেতিবাচকতার চিহ্ন।

পণ্ডিতগণ বলেন যে, কিছু প্রচলিত কুসংস্কার আছে যে, ইস্তিখারার ফল লাভের জন্য কিছু কিছু কাজ করা উচিত, যেমন ঘুমানো এবং স্বপ্নে কোনো চিহ্ন থাকা এবং এ

বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে কোনো নির্ভরযোগ্য উল্লেখ না থাকায় তারা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেন।

নির্ধারিত সময়ে নামায আদায়ের গুরুত্ব:

সালাত দিনে ৫ ওয়াক্তে ৫ বার ফরযে আইন (অবশ্যই পালনীয়)

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

উল্লিখিত সময় সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[300]

ইবন কাসীর রহ. তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন: "ইবন আব্বাস "মাওকূতান" এর তাফসীরে ফরয অর্থ নিয়েছেন"।

তিনি আরো উল্লেখ করেন: "হজের মতো সালাতেরও সময় নির্ধারিত"। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন: "ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হজের মতো সালাতেরও একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে"। এ সম্পর্কে আল-বুখারী (রহ.) বলেন: "উল্লিখিত সময় হলো নির্ধারিত (সময়)। তিনি সালাতের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।"

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةِ لَوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ أَزَادَنِي مُتَّفَقٌ عَلَيْه 'আবদুল্লাহ (রাঃ)] ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ 'আমাল আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সঠিক সময়ে সলাত আদায় করা। আমি বললাম, এরপর কোন্ 'আমাল? তিনি বললেন, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ 'আমাল? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। রাবী [ইবনু মাস'উদ (রহঃ)] বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু

---

300 সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এসব উত্তর দিলেন। আমি যদি আরও জিজ্ঞেস করতাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আরও কথা বলতেন।[301]

এই হাদীসে রাসূল (সা) সুস্পষ্ট করেছেন যে, নির্ধারিত সময়কে সালাত আদায় করা আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় 'আমল। এই 'আমলটিকে তিনি (সা) বাবা-মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। এর প্রমাণ হলো হাদীসে 'তারপর কী?' ক্রমবাচক পদবাচ্যের ব্যবহার। এই শব্দগুচ্ছটি গুরুত্বের ক্রম বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং আরবি ভাষাভাষীদের কাছে বিষয়টি সুপরিচিত।

আল-হাফিয ইবনু হাজার তার 'আল-ফাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "ইবনু বাযীযা বলেছেন: এক্ষেত্রে যা লক্ষণীয় তা হলো, সকল দৈহিক প্রচেষ্টার মধ্য থেকে জিহাদকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া, কারণ এতে আত্মত্যাগের বিষয়টি জড়িত। তবে ধৈর্য ধারনের বিষয়টি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ ফরজ সালাতগুলোকে রক্ষা করা, সেগুলোকে সঠিক সময়ে আদায় করা এবং নিজের মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণ করার বিষয়টি ধৈর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যা একটি সার্বক্ষণিক বিষয়। সত্যবাদীরা (সদীকূন) ব্যতীত অন্যকেউ আল্লাহর আদেশ পালনের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিকভাবে ধৈর্যশীল থাকতে পারে না। ধৈর্য ধারনের বিষয়টি নাফ্সের (কুপ্রবৃত্তির) বিরুদ্ধে জিহাদ। তাই নির্ধারিত সময়ে সালাত পড়া ধৈর্যশিল মুত্তাকী বান্দার কাজ। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

সাহাবীগণের যুগের তাফসীরের ইমামদের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কীভাবে হজের মতো সালাতেরও এক নির্ধারিত সময় সাব্যস্ত করেছেন। আর কে আছে এমন যে হজ নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে তা অসময়ে আদায় করবে? সালাতেরও সময় এমনি নির্ধারিত, কোনো শর'ঈ ওযর ব্যতীত

---

[301] সহীহ বুখারী- ৫২৭, মুসলিম- ৮৫, নাসায়ী- ৬১০, আহমাদ- ৩৮৯০, ইরওয়া- ১১৯৮, সহীহ আত্ তারগীব- ৩৯৭।

নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় না করলে আল্লাহ কবুল করবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন: "যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, দলীল-প্রমাণ ও নাযাতের উসীলা হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাযাতের উসীলা হবে না, বরং কারুন, ফিরআউন, হামান এবং উবাই ইবন খালাফের সাথে তার হাশর হবে"।[302]

আর যে ব্যক্তি সালাত ঠিক সময়ে আদায় করল না, সে সালাতের হিফাযতও করল না। তার পরিণতি কারূণ, ফিরআউন, হামান এবং উবাই ইবন খালাফের মত বড় বড় কাফেরের মত হবে।

মূসা ইবনু ইসমা'ঈল বলেন: আনাস থেকে গাইলান থেকে মাহদি বর্ণনা করেন যে: "একবার আনাস (রা) অনুপাত এবং আক্ষেপ করে বললেন, নবীর (সা) সময়ে যে সমস্ত ('আমল) দেখেছিলাম এখন তার একটিও দেখতে পাই না। এক ব্যক্তি বললেন, সালাত এখন বাকি আছে। আনাস (রা) বললেন, দেখো না! কীভাবে সালাতকে বিনষ্ট করেছ?[303]

এখানে তিনি মূলত সালাতের নির্ধারিত সময় পার করে দিয়ে অসময়ে সালাত আদায়ের বিষয়ে কথা বলছেন। আব্দুল 'আযীযের ভাই, উসমান ইবনু আবি রাউওয়াদ বলেন: "আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি একবার দামেস্কে আনাস ইবনু মালিকের কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি কাঁদছেন। তাই জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি কিছুক্ষন থেমে বললেন: হায়! যা কিছু দেখেছিলাম এখন তার কিছুই দেখছি না। এমনকি এই

302 মুসনাদে আহমদ

303 আল-বুখারী, খণ্ড: ১, অধ্যায়: ৭

সালাতকেও নষ্ট করা হচ্ছে।[304] 'ফাতহুল বারী-তে ইবনু হাজার (রহ.) বলেছেন: আল-মুহাল্লিব বলেছেন: 'নষ্ট করা হচ্ছে' এর অর্থ হলো উত্তম এবং নির্দেশিত সময় থেকে বিলম্ব করা। এর অর্থ এই নয় যে, তারা ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর সালাত আদায় করতেন।' ইবনু হাজার এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং বলেছেন, এর অর্থ হলো মূলত ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর সালাত আদায় করা। আনাস (রা) এই ব্যাপারে কান্নাকাটি করতেন আর আমরা কী করছি? আমাদের ক্ষেত্রে কী করা বাঞ্ছনীয়? সালাতের প্রতি অবহেলার জন্য এবং আল্লাহর অন্যান্য বিধিবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য আমাদের কি চোখের জলে নদী হয়ে যাওয়া উচিত নয়?

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ الخَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَه عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَه وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَه رَوَاهُ أَحْمَد وأبو داود وروى مالك والنَّسَائِي نحوه 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, যা আল্লাহ তা'আলা (বান্দার জন্য) ফারম্ করেছেন। যে ব্যক্তি এ সলাতের জন্য ভালভাবে উযূ করবে, সঠিক সময়ে আদায় করবে এবং এর রুকূ' ও খুশুকে পরিপূর্ণরূপে করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া'দা রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তা না করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়াদা নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।[305]

কা'ব ইবনু উল্লা (রা) বলেন: আল্লাহর রাসূল (সা) আমাদের কাছে এলেন এবং আমরা ছিলাম ৭ জনের একটি দল। আমাদের চারজন ছিল মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম আর বাকিরা আগে কখনো গোলাম ছিল না। আমরা মসজিদের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিলাম এবং তিনি (সা) বললেন: "তোমরা বসে আছো কেন?" আমরা বললাম আমরা সালাতের জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি (কা'ব) বললেন: তখন তিনি (সা) কিছুক্ষন চুপ করে

[304] আল-বুখারী, খণ্ড: ১, অধ্যায়: ৭

[305] iHadis.com- ৫৮৩, মালিক এবং নাসায়ী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

থাকলেন এবং আমাদের দিকে ফিরে বললেন: "তোমাদের রব কী বলেছেন তা কি তোমরা জানো?" আমরা বললাম "না।" তিনি (সা) বললেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের রব বলেছেন যে সঠিক সময়ে সালাত আদায় করে, ধারাবাহিকভাবে সালাতের হেফাজত করে এবং এর সত্যিকার গুরুত্বকে নগণ্য ভেবে একে বিনষ্ট না করে, তার সাথে আমার অঙ্গীকার হলো আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি সঠিক সময়ে সালাত আদায় করে না, ধারাবাহিকভাবে সালাতের হেফাজত করে না এবং এর সত্যিকার গুরুত্বকে নগণ্য ভেবে একে বিনষ্ট করে, তার সাথে আমার কোনো অঙ্গীকার নেই। আমি চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেবো আর চাইলে তাকে শাস্তি দিবো।[306]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন: একদিন নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: "তোমরা কি জানো, তোমাদের রব (সুবহানাহু ওয়া ত'আলা), কী বলেছেন?" আমরা বললাম: আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) ভালো জানেন। আল্লাহর রাসূল (সা) একথা তিনবার বলেন। অতঃপর বললেন: "আমার ক্ষমতা ও মহত্ত্বের কসম! যথা সময়ে সালাত আদায়কারী প্রত্যেককে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে নির্ধারিত সময়ের বাইরে অন্য কোনো সময় সালাত আদায় করবে, আমি তার প্রতি দয়াও করতে পারি আবার তাকে শাস্তিও দিতে পারি।[307]

---

306 আত-তাবারানী কর্তৃক আল-কাবীর গ্রন্থে এবং আহমাদ কর্তৃক আল-আওসাত গ্রন্থে বর্ণিত।

307 আত-তাবারানী কর্তৃক আল-কাবীর গ্রন্থে বর্ণিত

মোয়াজ্জিনের আযান শুনেও জামায়াতে হাজির না হওয়ার পরিণাম:

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের কঠোর সতর্ক বার্তাঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তির কাজ পরিস্কার জুলুম, কুফর এবং নিফাক ব্যতীত আর কিছুই নয়, যে ব্যক্তি মোয়াজ্জিনের আযান শুনেও জামায়াতে হাজির হলো না[308]

গুরুতর ওজর ব্যতিত জুমার নামায ও জামায়াতে শরীক না হওয়া মুনাফিকের আলামত। ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, জনৈক ব্যক্তি সারাদিন রোযা রাখে ও সারা রাত নফল নামায পড়ে। অথচ জুমা ও জামায়াতের সাথে নামাযে শরীক হয় না। তার বিষয় কী বলেন? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ ব্যক্তি জাহান্নামী হবে।[309]

ভাবনার বিষয় এই যে, রহমাতুল্লিল 'আলামীন, যিনি সারা বিশ্বের জন্যই যেখানে রহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ বিশ্ব জগতজুড়েই তিনি মহান আল্লাহর অশেষ রহমত (দয়ার সাগর)- যাঁর আচরণে কাট্টা কাফের পর্যন্ত শান্তি-স্বস্তি এবং নিরাপত্তা পেতেন। উম্মতের সামান্য দুঃখ-কষ্টও যাঁর ছিল অসহনীয়- কাল কেয়ামতের পর কঠিন হিসাব নিকাশ তথা হাশর দিবসে সকলে যখন ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি বলে হয়রান-পেরেশান হয়ে যাবেন, সেই মহাবিপদকালেও রউফুর রহিম-দয়াল নবী স্বীয় উম্মতের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে কেবল একটা দোয়াই করতে থাকবেন: রব্বি হাবলি উম'আয় আমার প্রতিপালক (রব) আমার উম্মতকে রক্ষা করুন'- এমন দয়াল নবী, দয়ার সাগর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত: যারা বিনা কারণে কেবলমাত্র মসজিদে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ে গাফেলতি (অলসতা) করে, তাদের ঘর জ্বালিয়ে

---

308 আহামাদ

309 জামে তিরমিযী, সূত্রঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজ ত্যাগকারীর ভয়াবহ শাস্তিঃ আবদুল হালিম খাঁ, প্রথম সংস্করণ

দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এতে সুস্পষ্টভাবে নামাযের জামায়াতের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

সময়মত নামায আদায় না কারার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়া'লার সতর্কবার্তা:

মহান আল্লাহ বলেন- فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُون
সুতরাং দুর্ভোগ ('ওয়াইল' জাহান্নামের একটি স্থান) সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন।[310]

তাফসীরকারকগণ এই আয়াতের তাফসীর করেন যে, এই আয়াত দ্বারা ঐ সমস্ত লোক বুঝায়, যারা সালাতকে তার সময় থেকে পিছিয়ে অসময়ে আদায় করে। সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُون আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন "এরা ঐ সমস্ত মানুষ যারা সালাতকে তার (প্রকৃত) সময়ে আদায় না করে পরে আদায় করে"।[311]

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুসল্লী (সালাত আদায়কারী) নামে অভিহিত করা সত্ত্বেও তাদেরকে ওয়াইলের হুশিয়ারী দিয়েছেন। কেননা তারা সালাত প্রকৃত সময়ের পরে আদায় করে। অতএব, সালাতকে আপন ওয়াক্ত থেকে পরে আদায় করার জন্য আল্লাহ যাদেরকে ওয়াইলের হুশিয়ারী দিয়েছেন।

---

310 সূরা আল-মাউন, আয়াত: ৪-৫

311 তাফসীর ইবন কাসীর

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যারা সালাত (নামায) সম্পর্কে উদাসীন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তা হচ্ছে শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করা। তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়াইল নামক কঠিন শাস্তির স্থান। কেউ বলেন, "ওয়াইল" হচ্ছে জাহান্নামের একটি

নিম্নভূমি। দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতসমূহ তার (ওয়াইলের) মধ্যে রাখা হলে তার কঠিন উত্তাপে তা গলে যাবে। অথচ এ স্থানটি বিলম্বে ও উদাসীন সালাত (নামায) আদায়কারীদের পরকালীন জগতের ঘরবাড়ী অর্থাৎ আবাসস্থল।[312] সুতরাং সালাতের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ওয়াক্ত। শর'ঈ ওযর ব্যতীত নির্ধারিত ওয়াক্ত নষ্ট করা যাবে না। অতএব, সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

নিজের খেয়াল খুশিমতো নামায আদায়কারী ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন-

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

অত:পর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।[313]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ সম্পূর্ণরূপে সালাত (নামায) পরিত্যাগ করা নয়, বরং তার অর্থ: একেবারে শেষ ওয়াক্তে সালাত (নামায) আদায় করা। ইমামুত্ তাবিঈন সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহিমাহুল্লাহ বলেন,

---

312 সূত্রঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজ ত্যাগকারীর ভয়াবহ শাস্তিঃ আবদুল হালিম খাঁ, প্রথম সংস্করণ

313 সূরাহ মারিয়াম, আয়াতঃ ৫৯ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, মূল: মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) অনুবাদে: মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪০, প্রথম প্রকাশ, ৯ম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

তারা সালাত (নামায) নষ্ট করলো-এর অর্থ হচ্ছে, আসরের ওয়াক্ত অত্যাসন্ন হওয়ার সময় যোহর ওয়াক্তের নামায আদায় করা, মাগরিবের ওয়াক্তের সাথে মিলিয়ে আসর নামায পড়া, ইশার ওয়াক্তের সাথে সংযুক্ত করে মাগরিব ওয়াক্তের ফৌত হয়ে (যাকে কাজা বলা হয়) যাওয়া নামায আদায় করা, ইশার সালাত (নামায) ফজর ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা এবং সূর্যোদয়ের সময় ফজর ওয়াক্তের নামায আদায় করা।[314]

সঠিক সময়ে নামায আদায়ের সাথে সাথে নামাযের নিয়ম-কানুন শিখার প্রতিও তেমনি তৎপর হতে হবে, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, صلوا كما رأيتموني أصلي "তোমরা সেভাবে সালাত পড় যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখ।[315]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল ও সালাত আদায় করল, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সালাম দিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিরে যাও পুনরায় সালাত আদায় কর, কেননা তুমি সালাতই আদায় কর নি। সে তিনবার একইভাবে আদায় করল।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লোকটির ওপর বিধান আরোপ করলেন যে, সে সালাতই আদায় করে নি শুধু তার সালাতে স্থিরতা না থাকার কারণে। আর এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন সালাত কীভাবে আদায় করতে হয়। অতএব সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে নামায আদায়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! আধুনিক জামানায় সময় নির্ণয়ে যান্ত্রিক ঘড়ির প্রচলন হওয়ায় এবং নিয়মিত ওয়াক্তমাফিক আযান প্রচারিত হওয়ায় নামাযের ওয়াক্ত জানা অতি সহজতর হয়েছে।

[314] সূত্রঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজ ত্যাগকারীর ভয়াবহ শাস্তিঃ আবদুল হালিম খাঁ

[315] সহীহ বুখারী

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নামায হচ্ছে: জামাতের সাথে এবং ওয়াক্তের শুরু অর্থাৎ আউয়াল ওয়াক্তের নামায। তবে নানান বাস্তব কারণে অনেক সময় সময়মত নামায আদায় কারো পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তখন করণীয় সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) নিম্নরূপ ফরমান পাওয়া যায়:

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার আগে এক রাকাআত (ফরজ নামাজ) পেল, সে ফজরের নামাজ পেল। (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ) আসর নামাযের সর্বনিম্ন সময়কাল:যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে আসরের এক রাকাআত নামাজ পেল, সে-ও আসরের নামাজ পেল।[316]

নারীদের ওপর ফরয বা যেকোন নামাযই জামা'আতে আদায় করা ওয়াজিব নয়:

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্যও নারীদের মসজিদে না গিয়ে ঘরে পড়লেই বেশি সওয়াব। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসংখ্য হাদিসে নারীদের পর্দা করার অত্যধিক তাগিদ করা হয়েছে। সেসব আয়াত ও হাদিস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যত দূর সম্ভব নারীদের নিজ গৃহে অবস্থান জরুরি। নারীদের মসজিদে আসার প্রতি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিরুৎসাহ প্রদান করেন। যেমন-

316 বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ

হজরত আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ক্ষুদ্র কক্ষে নারীদের নামাজ বড় কামরার নামাজের তুলনায় উত্তম। ঘরের নির্জন কোণে নামাজ ক্ষুদ্র কক্ষের নামাজের তুলনায় উত্তম।[317]

উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'নারীদের নামাজের উত্তম জায়গা হলো তাদের ঘরের নির্জন কোণ।[318]

নফল ও সুন্নাত নামায নিজ ঘরে অবস্থানে আদায় উত্তম:

হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে (ফরজ) নামাজ সম্পন্ন করে তখন তার উচিত সে যেন তার নামাজের কিছু অংশ (সুন্নাত নামাজ) নিজের বাড়ির জন্য রাখে। কারণ বাড়িতে আদায় করা কিছু নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।[319] হজরত যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা নিজ ঘরে নামাজ আদায় কর। যেহেতু ফরজ নামাজ ছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম নামাজ হলো নিজ ঘরে আদায় করা নামাজ।[320]

---

[317] আবু দাউদ, হাদিস: ৫৭০

[318] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৬৫৪২

[319] মুসলিম

[320] নাসাঈ

নামাযে একাগ্রতার গুরুত্ব:

প্রতিটি কাজে সফলতার জন্য মৌলিক শর্ত হ'ল একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা। আর এ বিষয়টি নামাযেরর ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের জন্য একাগ্রতার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বর্তমানে এই ব্যস্ত যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ একাগ্রতাবিহীন নামায শুধুমাত্র দায়সারা ও শারীরিক ব্যায়ামের উপকারিতা ব্যতীত তেমন কিছুই বয়ে আনে না। হৃদয়ে সৃষ্টি করে না প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত করার অনাবিল প্রশান্তি। সঞ্চারিত হয় না নেকী অর্জনের পথে অগ্রগামী হওয়ার এবং যাবতীয় অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার কোন অনুপ্রেরণা।

সার্বিক অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে রাসূল (সা:)- এর নিম্নোক্ত হাদীছটি একটি কঠিন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন: 'এই উম্মত হ'তে সর্বপ্রথম সালাতের একাগ্রতাকে উঠিয়ে নেয়া হবে, এমনকি তুমি তাদের মধ্যে কোন একাগ্রচিত্ত মুসল্লী খুঁজে পাবে না।[321]

একই বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে হুযায়ফা (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীতে। তিনি বলেন: 'সর্বপ্রথম তোমরা সালাতে একাগ্রতা হারাবে। অবশেষে হারাবে সালাত। অধিকাংশ সালাত আদায়কারীর মধ্যে কোন কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে না। হয়তো মসজিদে প্রবেশ করে একজন বিনয়ী-একাগ্রতা সম্পন্ন সালাত আদায়কারীকেও পাওয়া যাবে না।[322]

[321] ত্বাবারাণী; ছহীহুল জামে' হা/২৫৬৯

[322] ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৬), ১/৫১৭ পৃঃ

বস্তুতঃ খুশূবিহীন সালাত বান্দাকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে না। তাইতো আল্লাহ তা'আলা একাগ্রচিত্তের অধিকারী মুসল্লীদেরকেই সফল মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

খুশূ বা একাগ্রতার পরিচয়:

'খুশ্'-এর আভিধানিক অর্থ হ'ল দীনতার সাথে অবনত হওয়া, ধীরস্থির হওয়া ইত্যাদি। ইবনু কাছীর বলেন: খুশূ অর্থ- স্থিরতা, ধীরতা, গাম্ভীর্য, বিনয় ও নম্রতা।[323]

ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন: খুশূ হ'ল হৃদয়কে দীনতা ও বিনয়ের সাথে প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থাপন করা।[324] প্রত্যেক ইবাদত কবুল হওয়া এবং তার প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করার আবশ্যিক শর্ত হ'ল খুশু। আর শ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাতের ক্ষেত্রে এর আবশ্যিকতা যে কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন: 'তোমরা আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হও বিনীতভাবে।[325]

খুশূ কেবল বিশেষ কোনো আমলের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং খুশূ মুমিনের যিন্দেগীর বৈশিষ্ট্য। মুমিনের পুরো যিন্দেগীই হতে হবে খুশূওয়ালা যিন্দেগী। দ্বীন-দুনিয়ার সকল কাজেই খুশূ থাকা চাই। খুশূ থাকতে হবে মুমিনের চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, আওয়াজ-উচ্চারণ সবকিছুতে।

উদাহরণ স্বরূপ, হাঁটা-চলা ও কথাবার্তার খুশূ সম্পর্কে কুরআন করীমের ইরশাদ হয়েছে-

---

[323] ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম (দার তাইয়েবা, ১৪২০/১৯৯৯, ২য় সংস্করণ), ৬/৪১৮ পৃঃ

[324] মাদারিজুস সালেকীন ১/৫১৬ পৃঃ

[325] বাক্বারাহ ২/২৩৮

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ، وَ اقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

তুমি অহংকারবশত মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং পৃথিবীতে দম্ভ করে চলো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি হাঁটা-চলায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয় সবচেয়ে অপ্রীতিকর আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ![326]

এভাবে শরীরের প্রতিটা অঙ্গের খুশূ রয়েছে। তাই আমরা যদি এককথায় খুশূর অর্থ করতে চাই, তাহলে বলা যায় 'আমার প্রতিটা অঙ্গ শরীয়তের বিধান এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত হওয়া।'

প্রত্যেক নেকআমলের খুশূ রয়েছে। যেমন যাকাত আদায় করা বা আল্লাহর রাস্তায় দান করার খুশূ কী? শুনুন কুরআনের ভাষায়- وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَاۤ اٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ

এবং যারা যা কিছু দান করে, দান করার সময় তাদের অন্তর এই ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে।[327]

অর্থাৎ নেককাজে খরচ করুক বা আল্লাহর কোনো বান্দাকে সাহায্য করুকÑ কোনো অবস্থাতেই তার মাথায় আসে না যে, আমি করুণা করছি, কিংবা আমি প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য; বরং নিজের হালাল অর্থ থেকে কম বেশ যা-ই পেশ করে, তার অন্তরটা থাকে ভীত-কম্পিত। কুরআনের ভাষায়- وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ তাদের হৃদয় থাকে ভীত-কম্পিত।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاۤءً وَّ لَا شُكُوْرًا، اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا তারা আল্লাহর মহব্বতে

[326] সূরা লুকমান (৩১) : ১৮-১৯

[327] সূরা মুমিনূন (২৩) : ৬০

অভাবী, এতীম ও বন্দিকে আহার দান করে। (তাদের অভিব্যক্তি হল,) আমরা তো তোমাদের আহার করাই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না। আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক কঠিন, ভয়ংকর দিনের আশঙ্কা করি।[328]

নেককার ব্যক্তিরা দান করে এই চিন্তায় থাকে যে, এর মধ্যে কোনো ধরনের রিয়া যুক্ত হচ্ছে না তো? বা পরবর্তীতে খোঁটা যুক্ত হবে না তো? কিংবা আমার অজান্তে কোনো সমস্যা যুক্ত হয়ে আমলটি বাতিল হয়ে যাবে না তো? আল্লাহ মেহেরবানি করে কবুল করবেন তো? আখেরাতে আমি মুক্তি পাব তো? এসব চিন্তা তাদেরকে ভীত-কম্পিত রাখে।

একটা বিষয় মনে রাখা জরুরি যাকাত আদায় করার অর্থ মূলত গ্রহীতার 'হক' গ্রহীতার কাছে পৌঁছে দেওয়া। তেমনি আরো যেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত খরচ করাকে জরুরি করে দিয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে আমি আসলে কোনো দাতা-ই নই; আমি তো কেবল দায়িত্ব আদায় করছি মাত্র। কাজেই সেখানে আমি কাউকে কিছু দিচ্ছি বা কারো প্রতি অনুগ্রহ করছি- এমন কিছু ভাবার সুযোগই নেই। এমনিতে যে কোনো দানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কারণ যা দেওয়া হচ্ছে, সেটা তো আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকেই দিচ্ছি। ইরশাদ হয়েছে- وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ এবং আমি তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে।[329]

মোটকথা, প্রত্যেক নেক কাজে খুশূ রয়েছে। জাগতিক সকল কাজেও খুশূ রয়েছে । বিনয়ী মানুষ যারা এবং বিনয় যাদের জীবনের অংশ; আর বিনয় তো মুমিনের দায়েমী সিফাত। তারা সর্বদা আল্লাহকে হাযির-নাযির মনে করে তাঁর সামনে বিনয়ী থাকে। হ্যাঁ,

328 সূরা দাহর (৭৬) : ৮-১০

329 সূরা বাকারা (০২) : ৩

কখনো গাফলত এসে যায় সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু যতক্ষণ একথা মনে থাকবে যে, আল্লাহ হাযির-নাযির এবং আমি আল্লাহর সামনে আছি, সেই সময়টাতে বান্দা বিনয়ী হবেই।

যেমন নিজের ঘরকে সাধারণত মানুষ নিরাপদ মনে করে। কেউ নিজের ঘরে যাচ্ছে মানে নিরাপদ আবাসস্থলের দিকে যাচ্ছে। অথচ ঘর তখনই নিরাপদ হতে পারে, যখন আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তা দান করেন। কত মানুষের ঘরেই কত বিপদ আসে! কেউ আবার ঘর থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কেন হয় এসব? কারণ বান্দার জন্য আল্লাহ যখন যে স্থানে নিরাপত্তা দান করেন তখন সে স্থানটাই তার জন্য নিরাপদ।

সুতরাং ঘরে প্রবেশ করার সময়ও খুশূ অবলম্বন করা চাই। ঘরে প্রবেশের সময় আগে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা, তবে জুতা খোলার সময় বাম পায়ের জুতা আগে খোলা তারপর ডান পায়ের জুতা খোলা। সালাম দেওয়া। বিসমিল্লাহ ও মাসনূন দুআ পড়ে প্রবেশ করা। অনুভূতির সঙ্গে দুআ পড়া। এই হল ঘরে প্রবেশের খুশূ।

এজন্য বললাম, দ্বীন-দুনিয়ার সকল কাজে খুশূ হাসিলের বিষয় আছে, যদি আমি সচেতন থাকি। তবে খুশূ-এর সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হল ইবাদত। ইবাদতের মধ্যেও নামায, তিলাওয়াত, যিকির ও দুআ-মুনাজাত এগুলো হল খুশূর সবচে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এসব আমলে খুশূ হাসিল করতে পারলে, এর বরকতে যিন্দেগীর অন্যান্য ক্ষেত্রেও খুশূ হাসিল হওয়া সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যিকির, তিলাওয়াত ও দুআ-মুনাজাতে খুশূ হাসিলের উপায় সম্পর্কে গত মজলিসগুলোতে কিছু আলোচনা হয়েছিল। আজ নামাযের খুশূ সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

নামাযের খুশূ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস

প্রথমে এই বিষয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস আমরা আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলা বোঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন।

তাহিয়্যাতুল ওযুর বিষয়ে তিন সাহাবী থেকে তিনটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তিনজন সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহিয়্যাতুল ওযুর হাদীস শুনেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আমলটির ফযীলত তিন সাহাবীকে তিন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ফযীলতটা সবাইকে হুবহু একই ভাষায় বলেছেন তা কিন্তু নয়। এতে আমাদের ফায়দা বেশি হয়েছে। এই ভিন্ন ভিন্নভাবে বলাতে নামাযের খুশূ কীভাবে হয়, সে সম্পর্কেও আমরা হাদীসগুলোতে কিছু নির্দেশনা পেয়ে যাচ্ছি।

প্রথম হাদীস

এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে উকবা ইবনে আমের রা. থেকে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَه، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِه وَوَجْهِه، إِلّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة কোনো মুসলিম যখন উত্তমরূপে ওযু করে অতঃপর দুই রাকাত নামায এমনভাবে আদায় করে যে, তার চেহারা ও অন্তর তথা দেহ-মন পূর্ণ আল্লাহ-অভিমুখী থাকে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[330]

হাদীসে বলা হয়েছে, 'কোনো মুসলিম যদি ওযু করে এবং সুন্দরভাবে ওযু করে'। সুন্দরভাবে ওযু করার অর্থ সুন্নত মোতাবেক ওযু করা। যেমন ওযুর শুরুতে পবিত্রতার নিয়ত করা, বিসমিল্লাহ বলা, মিসওয়াক করা ইত্যাদি।

[330] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৪

এই যে পবিত্রতার নিয়তের কথা বলা হল, শরীয়তের দৃষ্টিতে পবিত্রতা কিন্তু অনেক ব্যাপক। পবিত্রতার বিভিন্ন ধরন আছে। একটা তো হল যাহেরী পবিত্রতা। এটা ছাড়া পবিত্রতার আরো বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন আকীদা-বিশ্বাসের পবিত্রতা, আমলের পবিত্রতা, চিন্তা-চেতনার পবিত্রতা, আখলাক-চরিত্র ও সীরতের পবিত্রতা এবং সর্বোপরি গোনাহ থেকে পবিত্রতা। ওযুর মাধ্যমে আমি এই সব ধরনের পবিত্রতার নিয়ত করতে পারি। আমি যেন এই ওযুর মাধ্যমে যাবতীয় গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যেতে পারি! ওযু সংশ্লিষ্ট যত দুআ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তাতেও এ বিষয়টার প্রতি ইঙ্গিত আছে। একটি দুআ এই- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِين হে আল্লাহ! আমাকে বেশি বেশি তওবাকারী এবং অধিক পবিত্রতা রক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।[331]

এই বর্ণনা থেকেও ওযুতে তওবার বিষয়টা পাওয়া যায়। আর ওযুর মাধ্যমে যে সগীরা গোনাহ মাফ হয়, সেটি তো অনেক সহীহ হাদীসে আছে। তো সগীরা গোনাহ মাফ হওয়ার পাশাপাশি আমি যদি খালেস দিলে তওবাও করে ফেলি, তাহলে তো কবীরা গোনাহগুলোও মাফ হবে। কারো হক নষ্ট করা হলে, এই ওযুর সময়ই যদি আমি আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করে ফেলি যে, 'আল্লাহ! আমি তার হকগুলো আদায় করে দেব। আমি নিয়ত করলাম, আপনি আমাকে তাওফীক দান করুন!' তাহলে আল্লাহ যেমন ক্ষমা করে দেবেন, তেমনি হক আদায় করার রাস্তাও বের করে দেবেন ইনশাআল্লাহ!

ওযুর মাঝে এই দুআ পড়ার কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِي হে আল্লাহ! আমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন। আমার আবাসকে প্রশস্ত করুন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন।[332]

---

331 জামে তিরিমিযী, হাদীস ৫৫

332 মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৭২৭৩; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, নাসায়ী, হাদীস ৮০; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী, হাদীস ২৮

এখানেও ইস্তিগফারের প্রসঙ্গ আছে। এজন্য ওযুকে ব্যাপকার্থে পবিত্রতা বানানো অনেক সহজ। সুতরাং খেয়াল করে নিয়তটাকে ব্যাপক করার চেষ্টা করতে হবে।

যাহোক হাদীসে প্রথমে সুন্দর করে ও সুন্নতসম্মতভাবে ওযু করার কথা বলা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে- ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ তারপর দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে।

مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ অর্থাৎ এমনভাবে নামায পড়ে যে, ওই নামাযের মধ্যে তার পুরো দিল-মন আটকানো। ডানে-বামে কোনো দিকে তাকাচ্ছে না, মনটাও এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে না; বরং দিল পরিপূর্ণ নামাযের দিকে ফেরানো। দৃষ্টিও সিজদার জায়গায় অবনত।

এখান থেকে নামাযের খুশূ-এর একটা স্তর আমরা পেয়ে যাই। এ স্তরটি অন্যান্য স্তরের তুলনায় তুলনামূলক সহজ। অর্থাৎ কেবল নামাযের দিকেই দিলের খেয়াল থাকা। তাকবীরে তাহরীমা থেকে শুরু করে সানা, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা যা পড়ছি, যেন খেয়াল করে পড়া হয়। সূরা ফাতেহা পড়ছি একথা যেমন খেয়ালে থাকবে, তেমনি সূরা ফাতেহায় আমি কী বলছি, কী পড়ছি সেটাও যেহেনে হাযির রাখবে। ইমামের পেছনে নামায পড়া অবস্থায় তো সূরা ফাতেহা ও পরবর্তী সূরা মেলানোর সময় চুপ থাকতে হয়। এই খামুশির সময়ও আমাকে নামাযের দিকেই মন রাখতে হবে। ভাবতে হবে, আমি আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে আছি। এখন আল্লাহর দরবারে রুকুতে যাচ্ছি। আর রুকু-সিজদাতে তো এমনিতেই তাসবীহ পাঠ করার আমল আছে।

মোটকথা, তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত নামায নিয়ে ব্যস্ত থাকব। হাদীসের শাব্দিক অর্থ হল, তার চেহারাটাও নামাযের দিকে, তার দিলটাও নামাযের দিকে। মুখে

যা পড়ছে, সব বুঝেশুনে পড়ছে। যা উচ্চারণ করছে, বুঝেশুনে উচ্চারণ করছে। এমন হয় না যে, আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় খবরই নেই, মুখে আত্তাহিয়্যাতু পড়ল, নাকি অন্যকিছু পড়ল! অর্থ বুঝুক আর না বুঝুক, যা পড়ছে, শব্দে শব্দে খেয়াল করে পড়বে। আর যদি অর্থ-মর্ম খেয়াল করে পড়ে, তাহলে তো কথাই নেই! খুশূ হয়েই গেল।

তাহলে তাহিয়্যাতুল ওযুর হাদীসে আমরা সকল নামাযের খুশূর সবক পেয়ে গেলাম। আমি নামায এমনভাবে পড়ব, যেন চেহারা ও দৃষ্টির সঙ্গে আমার মনটাও আল্লাহ-অভিমুখী থাকে। দিলের মধ্যে যেন এই খেয়াল থাকে যে, আমি এখন সূরা ফাতেহা পড়ছি, এখন আমি রুকুতে আছি, এখন সিজদাতে, এখন আত্তাহিয়্যাতু পড়ছি, এখন দরূদ শরীফ পড়ছি। একটা আমলও যেন আমার বে-খেয়ালিতে পার না হয়ে যায়। বেখেয়ালিতে যেন কোনো কিছু উচ্চারণ না হয়।

এই অনুশীলন যদি করতে পারি, ধীরে ধীরে অন্যগুলোও আসতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। খুশূর আরো গভীর দিক যেগুলো, সেগুলোর তুলনায় এই অনুশীলন সহজ।

এজন্য হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. এখান থেকে খুশূর সবক শুরু করিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এমন পাকা হাফেযের মতো পড়বে না যে, তার দিল যেখানেই থাকুক; মুখ চলতে থাকে; কোনো ভুল হয় না। বরং যে হাফেযের মনোযোগ না দিলেই লোকমার প্রয়োজন হয়, তার মতো খেয়াল করে করে পড়বে।
হাদীসের শেষাংশ- إِلّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব বা অবধারিত।

দ্বিতীয় হাদীস

দ্বিতীয় হাদীসটি তৃতীয় খলীফা উসমান রা. থেকে বর্ণিত। এটাও তাহিয়্যাতুল ওযু সম্পর্কে। হুমরান ইবনে আবান নামক একজন তাবেয়ী বলেনÑ ‘আমি উসমান রা.-কে ওযু করতে দেখলাম...’। এই বলে তিনি উসমান রা.-এর ওযুর বিবরণ দিলেন। তারপর

তিনি উসমান রা.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন; উসমান রা. বলেছেন- رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِي هذَا আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরকম ওযু করতে দেখেছি। ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ، إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه এরপর বলতে শুনেছি, আমি যেভাবে ওযু করেছি সেভাবে যে ওযু করবে, তারপর এমনভাবে দুই রাকাত নামায পড়বেÑ ওই সময় সে তার মনের সাথেও কোনো কথা বলবে না তার পেছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[333]

এখানে فَيُحْسِنُ وُضُوءَه. (উত্তমরূপে ওযু করবে) এ বাক্য বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে, আমি যেভাবে ওযু করেছি, সেভাবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, নবীজীর ওযু সর্বোৎকৃষ্ট ওযু। এখন এই ওযুর যে যত কাছাকাছি আসতে পারে, তার ওযু তত উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হবে। প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে সুন্দরভাবে ধোয়াÑ এটি সবাই পেরে যাব ইনশাআল্লাহ। সাথে অনুভূতি ও নিয়তের ক্ষেত্রে যে যতটুকু গভীরে অগ্রসর হতে পারে।

যাইহোক, এই হাদীসে খুশূর বিষয়ে বলা হয়েছে- ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ

এমনভাবে দুই রাকাত নামায পড়বে যে, সে তার মনের সাথেও কোনো কথা বলবে না।

নামাযে কি কেউ অন্য কারো সাথে কথা বলে? বলে না; বরং যা হয় সব তো নিজের মনের সঙ্গেই হয়। এখানে বলা হয়েছে, দুই রাকাত নামায এমনভাবে পড়বে যে, মনের সাথেও কথা বলবে না। অর্থাৎ এদিক-সেদিকের সব চিন্তা বাদ দিয়ে একেবারে নামাযেই সমাহিত হওয়া এবং ডুবে যাওয়া।

---

[333] সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৩৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৪২১

আগের হাদীসে খুশূর যে স্তরের কথা বলা হয়েছে, তার চেয়ে এটি আরো ওপরের। যদিও ওই হাদীসের মর্মের মধ্যেও এই স্তরটি রয়েছে, কিন্তু সে হাদীসের পাঠ থেকে প্রথম স্তরটির কথাই আগে বুঝে আসে। আর তাতে আমাদের জন্য একটি সহজ রাস্তা খুলল। সুতরাং আগের হাদীসের বার্তা অনুযায়ী আমরা মেহনত শুরু করে পৌঁছুতে পৌঁছুতে এখানে এসে উপনীত হতে পারি! এভাবে যদি কেউ দুই রাকাত নামায পড়তে পারে, তাহলে তার পেছনের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

তৃতীয় হাদীস

তৃতীয় হাদীসটি সাহাবী আমর ইবনে আবাসা রা. বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম (হাদীস ৮৩২), মুসনাদে আহমাদ (হাদীস ১৭০১৯)-সহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এটি বর্ণিত হয়েছে। লম্বা হাদীস। সেখানে তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওযুর সওয়াব ও ফযীলতের কথা বর্ণনা করেছেন, তারপর তাহিয়্যাতুল ওযুর নামাযের সওয়াবও বর্ণনা করেছেন। তখন উপস্থিত একজন তাঁকে সতর্ক করার জন্য বলে উঠলেন, আপনি কী বলছেন খেয়াল করে বলুন! আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? এত এত সওয়াব দেওয়া হবে কেবল একটা আমলের জন্য?! তখন তিনি বললেন-

يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِيْ، وَاقْتَرَبَ أَجَلِيْ، وَمَا بِيْ حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ وَلَا عَلى رَسُولِ اللهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلّا مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا حَتّي عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَدًا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُه أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِك ‘দেখ, আমি বুড়ো ও দুর্বল হয়ে গিয়েছি। মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহ ও রাসূলুল্লার বিষয়ে মিথ্যা বলার আমার কী প্রয়োজন? আমি যদি এটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার, পাঁচবার, ছয়বার, সাতবার না শুনতাম, তাহলে বলতাম না। কিন্তু এটি আমি তাঁর থেকে এর চেয়েও বেশিবার শুনেছি’

সেই হাদীসে ওযুর বিবরণ এবং ওযুর সওয়াব বর্ণনা করার পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي

وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلهِ ِهُوَ لَهُ أَهْلٌ، ওযু শেষ করে যদি সে নামাযে দাঁড়ায় তারপর আল্লাহর শান মোতাবেক তাঁর হামদ ও প্রশংসা করে, তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করতে থাকে এবং তার দিলটাকে আল্লাহর জন্য ফারেগ করে দেয়।

খেয়াল করুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلهِ এটা খুশূ-এর একেবারে ওপরের একটা স্তর। অর্থাৎ তার দিলে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ ছাড়া আর কিছুই নেই। তাহলে কী সওয়াব হবে? শুনুন- إِلّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّه 'তার মা যেদিন তাকে জন্ম দিয়েছে, সেদিন সে যেমন একেবারে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ ছিল, ওইভাবে নামাযের পরেও সে ঠিক এরকমই পবিত্র হয়ে যাবে।'

এখন আপনি যদি তাহিয়্যাতুল ওযুর পুরো নামাযে এই হালত ধরে রাখার উদ্দেশ্যে, নামাযের ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহ ঠিক ঠিকভাবে আদায় করার পাশাপাশি নামায সংক্ষিপ্ত করেন, তাহলে এতে আপত্তির কিছু নেই।

যাহোক এখন আমাদের এ হাদীসগুলো পড়ার মূল উদ্দেশ্য হল, এ হাদীসগুলো থেকে খুশূ-খুযূর সবক হাসিল করা। তবে প্রসঙ্গক্রমে আমরা ওযুর ফযীলত, তাহিয়্যাতুল ওযু বা ওযু-পরবর্তী নামাযের ফযীলত এবং খুশূ-খুযূর ফযীলতও জানতে পারলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন।

তিন হাদীসের তিনটা কথাই কাছাকাছি। দিলটা নামাযের দিকে থাকবে। নামাযে অন্য চিন্তা-ভাবনা করবে না। মূলত নামাযে আওয়াজবিহীন কথা চলতেই থাকে। নামায কথার জায়গা, কিন্তু তা আল্লাহর সঙ্গে। আমাদের হালত হল আল্লাহর সঙ্গে কথা চলতে থাকে বেখবর ও গাফলতের হালতে আর সঙ্গে অন্য কথাও চলে...!

নামায আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার জন্য, তাই নামাযে দিল-দেমাগ ও মন-মস্তিষ্ককে আল্লাহর জন্য ফারেগ করে দিতে হবে! এর জন্য অনুশীলন করতে হবে। আর অনুশীলন ও চর্চা করতে গেলে কিছু সহযোগী মাধ্যমেরও প্রয়োজন হয়।

নামাযে খুশূ হাসিলের সহায়ক তিনটি বিষয়:

আসলে আমরা চাই কী আমাদের ভাব দেখে মনে হয়, আমরা চাই নামাযের আগে-পরের সবকিছু থাকবে খুশূমুক্ত আর শুধু নামায হয়ে যাবে খুশূওয়ালা! এটা আসলে একটু কঠিনই বটে। নামাযকে খুশূযুক্ত করতে হলে নামাযের আগে-পরের সবকিছুকেই খুশূমুখী করার চেষ্টা করতে হবে। বরং ওযু থেকে যদি আমার খুশূ শুরু হয়, ঘর থেকে মসজিদে আসা যদি খুশূর সাথে হয়, তাহলে নামাযের খুশূ সহজ হবে।

মসজিদে এসে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়লাম, তারপর সুন্নত পড়লাম, তারপর ফরয শুরু করলাম এভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হলে মূল ফরয নামাযের মধ্যে খুশূটা অনেক সহজ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। কাজেই নামাযের খুশূর জন্য নামাযের আগে-পরের যিন্দেগীকে খুশূমুখী করার চেষ্টা করা।

অনেকের অবস্থা হল নামাযের সালাম ফেরাতে না ফেরাতে বের হওয়ার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ে। হাঁ, কারো বিশেষ প্রয়োজন হলে তো বের হবেই; তবে বেশি ঠ্যাকা না হলে কিছুক্ষণ বসে থাকার মধ্যেই ফায়েদা। এক ফায়েদা তো মসজিদে বসে থাকার ফায়েদা। দ্বিতীয় ফায়েদা হল, ফেরেশতারা এই ব্যক্তির জন্য দুআ করতে থাকে-
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَه، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْه আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন!

তৃতীয় আরেক ফায়দা হল, মানুষ কোনো প্রয়োজনে কারো কাছে গেলে বা কোনো অফিস-আদালতে গেলে প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর ফিরে আসে। তো মসজিদে এসেছি

কিছু আশা নিয়ে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশা। কুরআনে বলা হয়েছে وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب
সিজদা কর আর আল্লাহর নিকটে পৌঁছে যাও!

বোঝা গেল সিজদা ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়। আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের আশা নিয়ে আমি সিজদা করব। আমার জাগতিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত যত সমস্যা, আমার বা দেশের কিংবা পুরো উম্মত ও মুসলিম বিশ্বের যত সমস্যা, সব সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাআলা নামাযের মাধ্যমে করে দিতে পারেন। কারণ বলা হয়েছে- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوة- তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর।[334]

নামায বলতে কেবল নফল নামায নয়; বরং ফরয নামাযের মাধ্যমেও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা যায়। আমার সকল সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাআলা করে দেবেনÑ এ আশা নিয়ে মসজিদে এসেছি; কিন্তু তাড়াহুড়ো করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া মানে, কেমন যেন আমার সকল মাকসাদ হাসিল হয়ে গেছে। আমার যা দরকার সব পেয়ে গিয়েছি। অথচ ভাবটা থাকা দরকার ছিল এমন, যে উদ্দেশ্যে আমার আসা, সব কি আমার হাসিল হয়েছে? হাসিল করতে পেরেছি? আচ্ছা, আরেকটু বসে থাকি! যাদের হয়তো হাসিল হয়েছে, তারা চলে যাচ্ছে, আমারও কি হাসিল হয়ে গিয়েছে? এভাবে একটা অনুভূতি নিয়ে কিছুক্ষণ মসজিদে দেরি করতে পারি।

এটা মাসআলা বলছি না। মাসআলা তো আগেই বললাম যে, কারো প্রয়োজন থাকলে বের হতে পারে আর বসে থাকলে ফেরেশতার দুআ পাবে।

[334] সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

মসজিদ থেকে বের হওয়ার তরীকা

আচ্ছা, মসজিদ থেকে পাঁচ মিনিট আগে বের হই আর পরে; বের হওয়ার তরীকা কী হবে? মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নত আপনি যদি পাঁচটা বলেন, আমি ছয় নম্বরটা বলব। সেটি হল, মসজিদ থেকে এমন হালতে বের হব, যেন দিলটা মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে। হাদীসের ভাষায়- قَلْبُه مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِد দিলটা মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে

মসজিদ থেকে বের তো হতেই হবে। দ্বীন-দুনিয়ার কত যিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা মানুষকে দিয়েছেন! কেউ সারাদিন মসজিদে বসে থাকবে, এটা হয় না! আল্লাহ এটা চানও না! সূরা জুমুআতে আল্লাহ তাআলা প্রথমে বলেছেন, যখন আযান হয়, সমস্ত বেচাকেনা কাজ-কারবার বন্ধ করে মসজিদে চলে আসো! তারপর বলেছেন, নামায শেষ হয়ে গেলে-

فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ الله আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর 'ফযল' তালাশ কর। কিন্তু তখনো আল্লাহকে ভুলো না- وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن এবং আল্লাহকে স্মরণ কর বেশি বেশি; যাতে তোমরা সফলকাম হও।

যাইহোক, আল্লাহ আমাদের বলছেন, নামায শেষ করে মসজিদ থেকে বের হয়ে কাজে যাও, কিন্তু সেই যাওয়াটা কী হালতে হবে? হাদীসের ভাষ্য হল- قَلْبُه مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِد তার দিলটা মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকবে; অস্থির থাকবেÑ আবার কখন ফিরে আসব!

তো নামাযের পরের হালত হবে, আমি মসজিদে যে আশা ও অনুভূতি নিয়ে এসেছি, সেটি পূর্ণ হয়েছে কি না মনে এ ভয় থাকা এবং বের হওয়ার সময় দিলটা মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকা। সাথে বের হওয়ার দুআ পড়া اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِك অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার ফযল ও রিযিক চাই।

রিযিক অনেক ব্যাপক বিষয়। পানাহার যেমন রিযিক, সুস্থতাও রিযিক। দ্বীন-দুনিয়ার সকল খায়ের ও কল্যাণও রিযিক। একজন ছাত্রের মেধা দরকার। একজন তালিবুল ইলমের ইলম ও আমল দরকার। এ সবকিছু 'রিযক'-এর অন্তর্ভুক্ত। সবকিছু আল্লাহর নিকট চেয়েই আমি তাঁর ঘর থেকে বের হচ্ছি। সাথে আমার দিলটাও মসজিদের সঙ্গে আটকানো। যোহর পড়ে বের হয়েছি তো আসরের জন্য মনটা ব্যাকুল। আসর পড়ে বের হয়েছি তো মাগরিবের জন্য মন ব্যাকুল। বা অন্য কোনো উপলক্ষে বা উপলক্ষ ছাড়াও মসজিদে চলে আসা।

এভাবে নামাযের আগে-পরের অবস্থাকে যদি আমি খুশূমুখী করতে পারি, তবে নামাযের খুশূ সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় উপায় হল ইহসান-এর অনুশীলন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك
তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তবে তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।[335]

নামায শুরু করার আগেই চিন্তা করি যে, আমি তো আল্লাহর দরবারে এসেছি। আল্লাহ আমাকে দেখছেন। সুতরাং আমিও ইবাদতটা এমনভাবে করার চেষ্টা করি, যেন আমি আল্লাহকে দেখছি!

যদিও মূলত আমি দেখছি না বা দেখতে পারছি না, কারণ দুনিয়াতে আল্লাহকে কীভাবে দেখা যাবে; আর সে চোখও আমার নেই। কিন্তু আল্লাহর আজমত, মহত্ব ও বড়ত্ব এবং তাঁর গুণাবলি যেন আমার দিলে উপস্থিত থাকে, তাঁর রহমত ও কুদরতের কথা যেন

[335] সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮

স্মরণে থাকে, সর্বোপরি ‘আল্লাহ হাযির-নাযির’ এই চিন্তা যেন আমার মনে সদা জাগ্রত থাকে।

আল্লাহ আমাকে দেখছেন, কাজেই আমার ঠিকমতো আমলটা করা উচিত এই অনুভূতি হল ইহসান-এর একটা স্তর।

ইহসানের যে শিক্ষা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন সেটি যে কোনো আমলের জন্যই প্রযোজ্য। বিশেষত নামাযের জন্য। নামায শুরু করার সময়, বরং নিয়ত করার আগে যখন ওযু করে মসজিদের দিকে আসছি, তখন থেকেই এটা চিন্তা করি যে-

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهٗ يَرَاك তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তবে তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।

এর দ্বারা নামাযে দিল হাযির রাখার যে কথা বলা হয়েছে, তার প্রয়োগটা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় আরেকটি সূত্র নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীসে বলেছেন, যা আমরা গত মজলিসের আগের মজলিসে আলোচনা করেছি- صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ.
অর্থাৎ এমনভাবে নামায আদায় কর, যেন এটাই জীবনের শেষ নামায।

নিজের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত রাখার চেষ্টা করা চাই, আজই বুঝি আমার জীবনের শেষ নামায! জুমা পড়ে গেলাম, আসর পড়ার জন্য হয়তো আর আসার সুযোগ হবে না; বরং হয়তো এখানে আমার জানাযার জন্য লাশ আসতে পারে। আমার হয়তো নামাযের জন্য আর আসা হবে না! নামাযে দাঁড়ালেই নিজের ওপরে এই ভাবনাকে

হাযির করা যে, এটাই আমার জীবনের শেষ নামায! কাজেই যত সুন্দর করে পড়তে পারি।

এই তিন সূত্র বা কোনো এক সূত্র বা দুই সূত্র যদি আমরা অবলম্বন করি, তাহলে খুশূর ওই স্তরগুলো বিশেষত প্রথম হাদীসে যে স্তরের কথা বলা হয়েছে, সেটি হাসিল করা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

আলোচ্য তিন হাদীসের মধ্যেই চূড়ান্ত স্তর মূলত একই। কিন্তু স্তরের শুরু-শেষ আছে! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু উম্মতের প্রতি অনেক দরদী ছিলেন, কুরআনের ভাষায়- بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْم মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু।[336]

তাই তাঁর শিক্ষার মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক সহজতা। এমনভাবে দ্বীনের হেদায়েতগুলো পেশ করেছেন, যেন আল্লাহর বান্দাদের জন্য বিষয়গুলো আমলে নিয়ে আসা সহজ হয়ে যায়।

আর উপরোক্ত সূত্রগুলো থেকে কোনো সূত্র যদি আমরা অবলম্বন করি, তাহলে আরো সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

[336] সূরা তাওবা (৯) : ১২৮

একাগ্রচিত্ত নামাযের বাস্তব উদাহরণ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায:

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি যে আমল খুব প্রশান্তি দিতো তা হচ্ছে নামায। এই নামাযেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন হৃদয়ের প্রশান্তি, চোখের শীতলতা। দিনের আলোতে কি রাতের আঁধারে, রবের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার মাঝে তিনি যে প্রশান্তি পেতেন, তা অতুলনীয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অধিক শুকরিয়া আদায়কারী। সর্বক্ষন আল্লাহ তাআলার মহান নিয়ামত গুলোর শোকর আদায় করতেন। আল্লাহ প্রদত্ত নিইয়ামত গুলোর জন্য তাঁর কর্ম ছিল খুবই সংগতিপূর্ণ। এ কারনে তাঁর শোকর আদায় শুধু মৌখিক শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁর শোকর আদায় ছিল বাস্তব, জীবন্ত এবং জীবনযাপনের সাথে জড়িত।

এ কারণে আমরা তাঁর জীবনে দেখি, তিনি একাধারে সেজদাকারী, করুকুকারী আল্লাহতায়ালার ইবাদতকারী। কল্যাণকর কর্ম সম্পাদনকারী। আল্লাহতাআলার প্রশংসা জ্ঞাপনকারী। কুরআনুল কারিমে যে সকল আয়াতে ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, সে সকল আয়াতের একনিষ্ঠ অনুসরণকারী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুমিনগণ, রুকু করো, সেজদা করো, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো এবং সৎকর্ম করো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো।[337]

---

[337] সূরা হজ্ব: ৭৭

সাহাবায়ে কেরামের নামায:

অনেক হাদিস ও ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে, যেগুলো আমাদের সামনে রাসলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের প্রকৃত অবস্থা ফুটিয়ে তোলে। যেমন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত অধিক নামায আদায় করতেন যে, তার দুটি পা ফুলে যেত। একদিন আয়েশা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কেন এমনটা করেন! অথচ আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন!' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি একজন শোকর আদায়কারী বান্দা হতে চাই না?[338]

তাঁর এই সুন্দর অভিব্যক্তিই প্রকাশ করে আল্লাহতায়ালার ইবাদতের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি কখনোই ইবাদতকে নিছক কর্তব্য বলে মনে করতেন না। বরং তিনি নামাযে দাঁড়াতেন ভালোবাসা নিয়ে। নিজের উৎফুল্লতা ও আগ্রহ নিয়ে, গভীর মমতা নিয়ে। উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. আরেকটি হাদিসে নবীজির রাতের নামাজের চিত্র ও ধরন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগারো রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এ ছিল তাঁর রাত্রিকালীন নামাজ। এতে তিনি এত দীর্ঘ সেজদা করতেন যে, তাঁর মাথা ওঠানোর পূর্বে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারে এবং ফজরের নামাজের পূর্বে তিনি আরও দু-রাকাত পড়তেন। অতঃপর তিনি ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন, নামাজের জন্য মুআজ্জিন মসজিদে আসা পর্যন্ত।[339]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক নামাজ ও অধিক কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে প্রশান্তি পেতেন। যেমন: হজরত হুজাইফা রা. বর্ণনা করেন, এক

338 সহিহ বুখারিঃ হা/৪৮৩৭, সহিহ মুসলিম হা/২৮২০

339 সহিহ বুখারিঃ ৯৯৪, সুনানে আবু দাউদঃ ১৩৩৬

রাতে আমি নবীজির সাথে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করলাম। তিনি সুরা বাকারা পড়তে শুরু করলেন। আমি ভাবলাম তিনি হয়তো একশ আয়াত পড়ে রুকু করবেন। কিন্তু এর পরেও তিনি পড়তে থাকলেন। তখন আমি ভাবলাম তিনি এর (সুরা বাকারা) দ্বারা পুরো দুরাকাত পড়ে সালাম ফেরাবেন। কিন্তু তিনি এরপরও পড়তে থাকলেন। এবার আমি ভাবলাম সুরাটি শেষ করে তিনি হয়তো রুকু করবেন। কিন্তু এরপর তিনি সুরা নিসা'-ও পড়তে শুরু করলেন এবং তা শেষ করলেন। অতঃপর তিনি সুরা আলে ইমরান' শুরু করলেন এবং তা শেষ করলেন। তিনি থেমে থেমে ধীরে পড়ছিলেন এবং কোন তাসবিহর আয়াত এলে তাসবিহ পড়ছিলেন, কিছু চাওয়ার আয়াত এলে কিছু চাইছিলেন। যখন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পড়ছিলেন, তখন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। অতঃপর তিনি রুকু করলেন। রুকুতে তিনি পড়তে থাকলেন "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম'। তাঁর রুকু কিয়ামের মতই দীর্ঘ্য হল। এরপর "সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ" বললেন। এরপর যতক্ষণ সময় রুকু করেছিলেন, প্রায় ততক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর সেজদা করলেন সেজদায় পড়লেন সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" তাঁর এই সিজদাও প্রায় কিয়ামের সময়ের মতো দীর্ঘায়িত হলো।[340]

রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে অধিক নামায আদায় করতেন। কেননা এই সময়টি ছিল তাঁর ও তাঁর প্রতিপালকের একান্ত মুহূর্ত। এ কারণে তিনি রাতের নামাজ সম্পর্কে বলেন, أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل ফরয নামাযগুলোর পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হলো রাতের নামায।[341]

রাতের নামাজের সীমাহীন পছন্দের কারণে তার যদি কোন কারণে কোন নামাজ কাজা হয়ে যেত, তাহলে তিনি সেটা প্রভাতে আদায় করে নিতেন। যেমন হজরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন,

---

340 সহিহ মুসলিমঃ হা/৭৭২, সুনানে নাসায়িঃ হা/১১১৩, মুসনাদে আহমদঃ হা/২৩৪১৫

341 সুনানে আবু দাউদ: ২৪২৯, মুসনাদে আহমাদ: ৮৪৮৮

وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নফল নামায আদায় করলে, তা নিয়মিত আদায় করা পছন্দ করতেন। তবে যদি কোনদিন ঘুম বেশি হয়ে যেত অথবা তীব্র ব্যথা দেখা দিত, যাতে তাঁর জন্যে রাতে দাঁড়ানো সম্ভব হতোনা, তাহলে তিনি। দিনে বারো রাকাত নামাজ আদায় করে নিতেন।[342]

নামাযের প্রতি নবীজির এই বিশেষ ভালোবাসা আরও ভালো করে বোঝা যায় বিলাল রাঃ কে তাঁর এ কথা বলার মাধ্যমে- "হে বেলাল, তুমি দাঁড়াও, (অজান ও ইকামত দাও) এবং নামাজে মাধ্যমে আমাদের হৃদয়কে শান্ত করো।[343]

অন্য হাদিসে রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'আমার চোখের শীতলতা বা প্রশান্তি রাখা হয়েছে নামাযের মধ্যে।[344]

আচ্ছা, নামায তো আমরাও পড়ি। নামাযের জন্য প্রতিদিনই আমরা আমাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করি। কিন্তু আমাদের এই নামায কি আমাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করে? এমনটা কয়দিন হয়েছে, নামায পড়ে মনে খুব পরিতৃপ্তি অনুভব হয়েছে? আসলে নামাজের প্রকৃত পরিচয়টাই আমাদের অজানা। আমরা নামাযের নিয়মকানুন জানলেও জানি না কীভাবে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে উপভোগ করতেন। ফলে আমাদের নামায হয়ত হয়ে যায়, কিন্তু সেই নামাজে প্রাণ থাকে না। আমাদের ভিতর রেখাপাত করে না, জীবনে কোনো পরিবর্তন আনে না। আমাদের নামাযকে ফলপ্রসূ

342 সহিহ মুসলিম: ৭৪৬, মুসনাদে আহমাদ: ২৪৩১৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৫৫২

343 সুনানে আবু দাউদ ৪৯৮৫, মুসনাদে আহমাদ: ২৩১৩৭, আল মুজামুল কবির: ৬২১৫

344 মুসনাদে আহমাদ: ১৩৫২৬, সুনানে নাসায়ি; ৩৯৩৯, আল মুজামুল কাবির: ১৭৩৮৮

করতে হলে রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে।[345]

হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা) বাগানে নামাযের সময় পাখির দিকে খেয়াল করায় রাকাআতের সংখ্যা ভুলে যাওয়ার কাফফারা হিসেবে ঐ বাগানটাই আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য রাসূল সাল্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দিয়ে দিলেন।

সালাফে সালেহীনের নামায:

সালাফে সালেহীনের বিনয় ও একাগ্রতার কতিপয় বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় তাঁদের নামাযের প্রতি একনিষ্ঠতা দেখে-

১। 'আমের আবদে কায়েস আম্বারীকে বলা হলো: "আপনি কি সালাতে স্বীয় আত্মার সাথে কথা বলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আমার আত্মা সাথে আল্লাহর সম্মুখীন এবং স্বীয় পরিণাম সম্পর্কে কথা বলি।"

২। 'আলী ইবন হুসাইন ইবন যাইনুল আবেদীন যখন সালাতে দাঁড়াতেন তার কম্পন শুরু হয়ে যেত। যখন এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: "তোমরা কি জান না যে, আমি কার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই এবং কথোপকথন করি"? একবার তার বাড়ীতে আগুন লেগে যায় আর তিনি তখন সাজদারত ছিলেন। সাজদাহ থেকে তিনি যখন মাথা উঠান সে সময় আগুন নিভে গিয়েছিল, এ ব্যাপারে তাকে বলা হলে তিনি বলেন, "আমাকে অন্য আরেকটি আগুনে এই আগুন থেকে বিমুখ করে রেখেছিল।"

[345] সহায়ক গ্রন্থ- উসওয়াতুল লিল আলামিন-ডঃ রাগিব সারজানি; অনুবাদ-শামীম আহমাদ। মাকতাবাতুল হাসান প্রকাশনা

৩। মুসলিম ইবন ইয়াসার আল বাসারী যখন সালাত আদায় করতেন মনে হতো যেন একটি কাঠ দাঁড়ানো আছে। এদিক সেদিক ঝুঁকতেন না এবং যখন সালাত শুরু করতেন তার পরিবারকে বলতেন: "তোমরা কথপোকথন করকেননা আমি, তোমাদের কথা শুনতে পাই না।"

৪। আ'মাশ বলেন" ইবরাহীম আত-তাইমী যখন সাজদাহ করতেন মনে হতো তিনি যেন কোনো দেওয়ালের অংশ এবং চড়ুই পাখী তাঁর পিঠে বসে যেত।"

৫। আহমদ ইবনে সিনান বলেন, "আমি ওয়াকীকে দেখেছি যখন তিনি সালাতে দাঁড়াতেন সামান্যতমও নড়াচড়া করতেন' না এবং উভয় পায়ে ভর না দিয়ে শুধু এক পায়ে ভর করে ঝুঁকে যেতেন না।"

৬। ইয়া'কুব ইবন ইয়াযীদ বাসরীর একবার সালাতের অবস্থায় কাঁধ থেকে চাদর চুরি হয়ে যায় এবং তাকে এরপর ফিরিয়ে দেওয়া হয় সালাতে মগ্ন থাকার জন্য তিনি তা অনুভবও করতে পারেন নি। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন। কিন্তু,

৭। মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কুব বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবন নাসর মারওয়াযীর চেয়ে উত্তম সালাত আদায়কারী অন্য কাউকে দেখি নি, তার কানে মাছি বসতো এবং রক্ত বয়ে যেত, কিন্তু তিনি মাছিকে সরাতেন না, অতঃপর তিনি বলেন, তিনি স্বীয় চিবুক (থুৎনি) বুকে রেখে এমনভাবে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন যে মনে হতো তিনি একটি স্থাপনকৃত কাঠ।[346]

নামাজ না পড়ার পরিনতি:

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِي وَابْن مَاجَة

বুরায়দাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা হল

[346] সহায়ক সূত্রঃ (ইমাম যাহাবী রহ-এর "সিয়ারু আলামিন নুবালা" এর তাহযীব, মুহাম্মাদ ইবন হাসান ইবন আকীলের "নুযহাতুল ফুযালা" থেকে সংকলিত

সলাত। অতএব যে সলাত পরিত্যাগ করবে, সে (প্রকাশ্যে) কুফরী করল (অর্থাৎ কাফির হয়ে যাবে)।[347]

নামায পরিত্যাগ করা কঠিন গুনাহের কাজ আর এর শাস্তিও কঠিন। নিচে নামাজ না পড়ার পরিণতি আলোচনা করা হলো-

(১) বেনামাযীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে, যেমন সহীহ বুখারীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্বপ্নের বর্ণনায় রয়েছে: "তিনি চিৎ অবস্থায় শায়িত এক ব্যক্তির নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় একটি পাথর হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একজন, অতঃপর সে উক্ত পাথর দিয়ে তার (শায়িত ব্যক্তির) মাথায় আঘাত করছে, যার ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে, পুনরায় সে দৌড়ে গিয়ে পাথরটি নিয়ে ফিরা মাত্র উক্ত ব্যক্তির মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় ঐ ব্যক্তি আপন স্থানে ফিরে তাকে ঐ ভাবেই (শাস্তি) দিচ্ছে যেভাবে প্রথমবার দিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তখন দুই ফিরিশতা তাঁকে অবহিত করেন যে, এতো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পড়ত, কিন্তু তার প্রতি আমল করত না এবং ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমাত। কত বড় শাস্তি! শুধু এই জন্য যে বেনামাযী ফরয সালাতকে মাথায় বড় বোঝা মনে করত, তাই মাথায় পাথর মেরে মেরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।

(২) কিয়ামতের দিন কাফির সরদার কারুন, ফির'আউন, হামান ও উবাই ইবন খালফের সাথে বেনামাযীর হাশর হবে। যেমন, হাদীসে এসেছে: "যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না এবং কারুন, ফির'আউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে।" [১৮ঐ] (মুসনাদে ইমাম আহমদ) ইমাম আহমদ

[347] মিশকাতুলমাসাবিহ-পর্ব-৪০ঃ সালাত-৫৭৪, হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস

রহ. এ হাদীসকে সালাত পরিত্যাগকারীর কুফুরীর ব্যাপারে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা বড় বড় কাফিরদের সাথে বেনামাযীর হাশর হওয়ার জন্য তার কুফুরী সাব্যস্ত হওয়া চাই। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "এই চার জনকে বিশেষভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের নেতা।

(৩) বেনামাযী জাহান্নামে যাবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) المدثر: ٤٢ ، ٤٣

"তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।[348]

(৪) বেনামাযী স্বীয় পরিবার এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করে দেওয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله

"যে ব্যক্তির আসর সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল।[349]

অতএব, যে সমস্ত সালাত ছেড়ে দেয় তার কি অবস্থা হবে?

(৫) বেনামাযীকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের এক খালে নিক্ষেপ করা হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَٰتُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই "গাইয়া" প্রত্যক্ষ করবে।[350]

---

348 সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪২-৪৩

349 সহীহ মুসলিম

350 সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯

আপনি কি জানেন "গাইয়া" কী? গাইয়া হলো, জাহান্নামের একটি নদীর তলদেশ, যার গভীরতা অনেক, যেখানে রয়েছে রক্ত ও পুঁজের নিকৃষ্টতম আস্বাদ।[351] গাইয়ার উক্ত তাফসীর আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যেমন ইবনুল কাইয়্যেম রহ. কিতাবুস সালাতে উল্লেখ করেছেন।

সালাত পরিত্যাগকারীর ইহকালীন বিধান:

সালাত আদায়কারী মুসলিম নারীর সাথে বেনামাযীর বিয়ে দেওয়া নাজায়েয। তার অভিভাবকত্ব বিলুপ্ত, তার জবাহকৃত গোশত খাওয়া নাজায়েয, সে তার কোনো আত্মীয়ের সম্পত্তির অংশ পাবে না। তেমনি তার আত্মীয়গণও তার থেকে কোনো অংশের অধিকারী হবে না, মারা গেলে তার জানাযা আদায় করা যাবে না, তার ক্ষমা ও করুণার জন্য দো'আ করা যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না এবং সে দীনী ভাই হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তার থেকে বিমুখ হওয়া ও তার সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করা ওয়াজিব।[352]

নেফাকিপূর্ন নামাযের ব্যাপারে সতর্কতাঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়া'লা ইরশাদ করেন- إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخْدِعُونَ اللهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ، وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا 'নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। আর তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।[353] অর্থাৎ নামাযে অলস অমনযোগী ভাবে দাঁড়ানো নেফাকির আলামত। নেফাকি হলো অন্তরের এমন একটা ব্যাধি, যা ঈমানের নূর ও

---

[351] তাফসীর ইবন কাসীর

[352] শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীনের "সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান" নামক রিসালা থেকে সংকলিত

[353] সূরা-নিসা: ১৪২

এর থেকে পুরোপুরি উপকৃত হবার পথে অনেক বড় প্রতিবন্ধক। বর্তমান সময়ের মুসলিমদের মধ্যে এই ব্যাধিটা সবচে প্রকট। এর ঘাড়ে সওয়ার হয়ে পরবর্তীতে অন্য আরো অনেক ব্যাধি একজন ব্যক্তির মনে বাসা বাঁধে। নামায আদায় করাই কিন্তু শেষ কথা নয়। এই আয়াত থেকে বুঝে আসে, নামায আদায়কারী হয়েও একজন মানুষ নিফাকে আক্রান্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে দেখার বিষয় হলো, সেই নামায কতটুকু নিজ আগ্রহ-উদ্দীপনায় আর কতটুকু পরিবার- সমাজের লোকচক্ষুর ভয়ে আদায় করা হচ্ছে। কারণ বহু মানুষ এমন আছে, যিনি কোথাও গেলে নিজের ইমেজ ঠিক রাখার জন্য হলেও নামাযটা আগে আগে বা মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করেন। কিন্তু নিজ ঘরে অবস্থানকালে হয়ত ঠিক মতো সালাত আদায়ই করেন না, অথবা কোন মতে অলসভাবে শুধু 'সেজদা মেরে' দায়িত্বমুক্ত হন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল ও সালাত আদায় করল তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সালাম দিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিরে যাও পুনরায় সালাত আদায় কর, কেননা তুমি সালাতই আদায় কর নি। সে তিনবার একইভাবে আদায় করল।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লোকটির ওপর বিধান আরোপ করলেন যে, সে সালাতই আদায় করে নি শুধু তার সালাতে স্থিরতা না থাকার কারণে। আর এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন সালাত কীভাবে আদায় করতে হয়। অতএব ধীরস্থির ভাবে মনোযোগের সাথে সঠিক নিয়মে নামায আদায় করতে হবে।

মানুষের অবস্থা সবসময় সমান থাকে না। এমনও হতে পারে যে, সপ্তাহের শুরুতে নিফাকের ব্যাধি ছিল না। কিন্তু সপ্তাহান্তে তা অন্তরে উদগত হয়ে পুরো তনুমনকে ঝেঁকে ধরেছে। সেজন্য মাঝেমাঝে নিজের অবস্থা যাচাই করা উচিত। নিয়মিত সামান্য সময় নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তা কোন অবস্থানে আছে এটি নির্ণয় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে দীর্ঘমেয়াদী ও পোক্ত নেফাকির হাত থেকে সহজেই মুক্তি সম্ভব।

শেষকথা:

উল্লিখিত আলোচনা পর্যালচনা প্রমাণ নামাযের গুরুত্ব, ফযীলত এবং ইহকাল ও পরকালে তার উপকারিতা ও ফলাফলের স্পষ্ট দলীল। এই ফলাফল ও ফযীলত নামাযের পুরোপুরি সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্বদানকারীর জন্যই অর্জন হতে পারে।

হাদীসে আছে যে, জান্নাতবাসীদের একটি আফসোস ছাড়া জান্নাতে আর কোন মনোবেদনা থাকবে না। দুনিয়াতে যে সময়টা আল্লাহকে ভুলে থেকে কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে ঐ অবহেলার জন্যই আফসোস করতে থাকবে। জান্নাত তো ঐ চিরস্থায়ী বাসস্থানেরই নাম যেখানে সামান্যতম দুঃখ কষ্ট এমনকি অভাব পর্যন্ত থাকবে না। অথচ একটা বিষয়ে আফসোস থেকেই যাবে। আফসোস তো মনোবেদনারই সৃষ্টি করে। এ আফসোসের কারণ তালাশ করলে হাদীসের বিবরণ থেকে তা বুঝা যায়। আল্লাহর দীদারই বেহেশতের সকল নিয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নিয়মাত বলে বেহেশত বাসীরা মনে করবে। আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাওয়ার চেয়ে বড় তৃপ্তি আর কোনটাতেই তারা বোধ করবে না। আর সবাই সমান পরিমাণ সময় আল্লাহকে দেখতে পাবে না। যে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে যত বেশি স্মরণ করেছে সে তত বেশি সময় আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে। তাই যারা কম সময় দেখার সুয়োগ পাবে তারাই হয়তো ঐরকম আফসোস করবে। তাই দুনিয়াতে যারা যতবেশি নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারবে তারা তারা ততবেশি সময় ধরে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأخبروا العاء সেজদারত অবস্থায় বান্দা তার প্রতিপালকের সবচেয়ে বেশি নৈকট্য অর্জন করে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কাছে সবচেয়ে পছন্দের আমল নামায, কারন এই নামাযের মাধ্যমেই বান্দা তার প্রতিপালকের দাসত্বের প্রমাণ পেশ করতে পারে। তার

রবের সাথে সরাসরি আবেদন নিবেদন পেশ করতে পারে। বান্দার সাথে তার রবের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম এই নামায। আল্লাহর দিদার লাভ করার মাধ্যমও নামায। কেননা হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি ফজর আসর নামায আদায়কারীর কিয়ামতের দিন আল্লাহর দিদার বা সাক্ষাৎ লাভ করবে। অতএব, আমাদের কারো নামাযের ব্যাপারে উদাসিন্য থাকলে হঠাৎ চলে আসা সমস্ত স্বাদ সাঙ্গকারী সকল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্নকারী মৃত্যু গ্রাস করার পূর্বেই আমাদের একান্ত তাওবা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হতে হবে। নতুবা শুধু আফসোস আর লজ্জা ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

নিম্নোক্ত আয়াত সমূহের প্রতি লক্ষ্য করি:

قُلْ يُعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ٥٣ "বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[354]

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُون ٥٤

তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পন কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসবার পূর্বে; অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।[355]

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُون ٥٥

অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট থেকে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে।[356]

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ٥٦

যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।[357]

---

354 সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩

355 সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৪

356 সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৫

357 সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৬

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَيْنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

অথবা কেউ যেন না বলে, আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম।[358]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সমস্ত গুনাহ-খাতা থেকে তাওবা করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করার ওয়াদা করছেন। কিন্তু তাওবা করার পরে কি করা উচিৎ? আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, আমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করব, তাঁর বিধি-বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করব এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওবার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা থেকে সাবধান করেন। কেননা মৃত্যু এমন সময় এসে পড়বে যে মানুষ তা বুঝতেও পারবে না, পরে তার জন্য আফসোস ও লজ্জা ব্যতীত আর কিছু থাকবে না। أن تَقُولَ نَفْسَ يُحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللهِ [الزمر: ٥٦

"যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস![359]

নামাযে শিথিলতাকারী বলবে: হায় আফসোস! আমি নামাযে বা নামাযের জামা'আতে, ফজরের নামাযে বা তা ব্যতীত আল্লাহ এবং রাসূলের অনুসরণে শৈথিল্য করেছি। আর ঐ ব্যক্তি স্বীয় গুনাহ-খাতার জন্য আফসোস করবে।

অতএব, আমাদের সবার কর্তব্য, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون

[358] সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৭-৫৮

[359] সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৬

হে মুমিনগণ তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[360]

আল্লাহতায়া'লা আমাদেরকে নামায ও এর খুশৃ' (বিনম্রতা) হেফাজতকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুক। পাশাপাশি তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পালনে সক্ষম করুক। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

360 সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১